জাতীয় সংসদ
নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন

ফরিদা আখতার

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা

৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণ: ২০ জানুয়ারি, ২০২৩

জাতীয় সংসদ: নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন
ফরিদা আখতার

প্রকাশক:
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৬/৮ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০২৫৮১৫৫০১৫/০২৪৮১১০৯৮৭

মূল্য: ২০০ টাকা (দুই শত টাকা)

@ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা

Jatiya Sangsad: Nari Ashon e shorashori nirbachon
(National Parliament: Direct Election in women's reserve seats)
By *Farida Akhter*
First Edition: 20 January, 2023
ISBN: 984-467-065-x

Published by:
Narigrantha Prabartana
(Women's Resource Center)
6/8 Sir Syed Road, Mohammadpur
Dhaka - 1207, Bangladesh.
Phone: 88-0258155015/024810987
E-mail: narigrantha@gmail.com
www.ubinig.org
https://www.facebook.com/Narigrantha/

Price: 200 (BDT)/ Two hundred Taka only

উৎসর্গ

নারী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি,
যারা নব্বইয়ের দশকে সংরক্ষিত আসনে
সরাসরি নির্বাচনের জন্যে লড়েছেন

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ১৯৮৯ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীদের জন্য নির্দিষ্ট এই একমাত্র জায়গা যেখানে পড়াশুনা, সভা, আড্ডা এবং নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সংগঠিত হবার ক্ষেত্র। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা বাংলাদেশে প্রথম নারীদের দ্বারা এবং নারীদের জন্যে লেখা বইয়ের প্রকাশক; একই সাথে নারী আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং আন্দোলনে মাঠে থাকার কাজও নিয়মিতভাবে করবার কাজ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা করছে। সেইসব কাজের মধ্য নারীদের বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন নেটওয়ার্কও গড়ে উঠেছে।

নারী বিষয়ক বইপত্র পড়া, লেখালিখি ও গবেষণা ছাড়াও নারীগ্রন্থ প্রবর্তনায় নারীদের জন্য নিজেদের মত করে বইপত্র, আড্ডা দেয়া, পরস্পরকে জানার জন্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীরা আসেন। বিশেষ ভাবে শ্রমিক নারী, কৃষক নারী, পেশাজীবি-কর্মজীবি নারী এবং সংসারে গার্হস্থ্য কাজে ব্যস্ত নারীরাও সহজে ও সাবলীল ভাবে সকলের সঙ্গে মিলিত হবার পরিবেশ রাখা হয়। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে মহিলা মুক্তি যোদ্ধা সমাবেশ, নারী লেখিকা ও বই মেলা, বাংলা শত বছর পূর্তিতে শত নারীর সংবর্ধনা, ইত্যাদি।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা সারাদেশে দুটি গুরুত্বপুর্ণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছে। একটি হচ্ছে নারী ও প্রাণবৈচিত্র্য নেটওয়ার্ক এবং অন্যটি হচ্ছে তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ)।

ফরিদা আখতার, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার সভানেত্রী এবং উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক।

সূচী

ভূমিকা ৭

অধ্যায় ১: সংবিধান ও সংরক্ষিত নারী আসন ১৩

অধ্যায় দুই: নারী আন্দোলনের দাবী ১৭

সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচনের প্রশ্নে নারী সংগঠনের দাবী ১৭
ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের ১৭ দফা ১৭
ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ১৭
পায়রাবন্দ ঘোষণা: রোকেয়া দিবসে নারী সংগঠনের দাবী ২১
সম্মিলিত নারী সমাজের দাবী ২২
নারী সংগঠনসমূহের দাবী: ২৩
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ নারী সংগঠনগুলোর দাবী: ২৪
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ২৪
নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার আলোচনা সভা ২৫
তিন সভার আলোচনা থেকে কয়েকটি প্রস্তাব: ২৬

অধ্যায় তিন: পত্রপত্রিকায় যা লিখেছি ৩১

হয় সরাসরি নির্বাচন দিন, নইলে সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বিলোপ করুন ৩১
সংরক্ষিত আসন নিয়ে তাহলে এ কিসের খেলা চলছে? ৩৩
আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বহীনতা ৩৫
সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি জটিল হয়ে উঠছে ৩৬

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কি সংরক্ষিত আসনের গার্জেনের ভূমিকায় নেমেছে? ৩৭
সংরক্ষিত আসন নিয়ে কানাঘুষা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব ৪৩
সংসদ থেকে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত হতে চলেছে ৪৮
প্রসঙ্গ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন: এবার একটি সমাধান আসা যাক ৫২
সংসদের ফুটবল ময়দানে আইনমন্ত্রীর কালো গোল ৫৬
সংরক্ষিত আসন বিল পাস নাকি জোট সরকারের বিদায় ঘন্টা? ৫৯
সংরক্ষিত আসন নিয়ে খালেদা হাসিনার বক্তব্য ৬৪
নয়টি সংরক্ষিত আসন পেয়ে আ্ওয়ামী লীগ চিৎপটাং ৬৬
সংরক্ষিত আসনের 'বিশেষ সুবিধা' আসলে কার? ৭০
নারীর অবমাননা ও জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের 'নীরবতা' ৭৪

অধ্যায় চার: নারী আসন ও মামলা ৭৯

সংসদে নারী আসন বিল ও নারী সংগঠনের মামলা ৭৯
মামলা: সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ৮৩
মামলার রায় ৮৫
সংসদে নারী আসন নাকি বিএনপির নারী নেত্রীদের স্পোর্টস !! ৮৬
সংরক্ষিত আসন বিল: ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর ৯১
অস্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে আনুপাতিক হারে মনোনয়নের বিধান ৯৬

ভূমিকা

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা থেকে ১৯৯৯ সালে 'সংরক্ষিত আসন: সরাসরি নির্বাচন' গবেষণা গ্রন্থটি বেরোয়। তারই ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় সংসদ: নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন' বইটি লেখা হোল।

১৯৮৯ সালে হাজির হবার পর থেকেই নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা নারীদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করছে। নব্বইয়ের শেষের দিকে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ইস্যুটি সামনে চলে আসে। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা সেই সময় আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিল। বিশেষ করে নারী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যা সবসময় সহজ ছিল না। এই সভায় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এসে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী আন্দোলনের দাবীর মধ্যে যুক্তি ছিল। ফলে সেই যুক্তি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কারো পক্ষেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সেই সব আলোচনা বিস্তারিত বর্ণনাসহ 'সংরক্ষিত আসন: সরাসরি নির্বাচন' বইটিতে ছাপা হয়েছিল। বইটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতও হয়েছে, কিন্তু আজ পুস্তিকাটির আর কোন কপি নাই।

কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় হচ্ছে এই ২০২৩ সালে এসেও সরাসরি নির্বাচনের দাবী তুলতে হচ্ছে। একাদশ জাতীয় সংসদ পর্যন্ত এসে দেখা যাচ্ছে আসন সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সংরক্ষিত আসন এখনো সরাসরি নির্বাচনের মুখ দেখে নি। তার প্রধান কারণ সংসদে আসন দখলকারী বড় দুটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থের সঙ্গে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন নিশ্চিত করবার দাবি সাংঘর্ষিক। ফলে বড় দলগুলোর এই ক্ষেত্রে ইচ্ছার তীব্র অভাব রয়েছে। অন্যান্য দলের রয়েছে রহস্যজনক নীরবতা। একই সাথে বলতে হয় বড় রাজনৈতিক দলের নারী সদস্যরাও দলের পুরুষ বা নেতৃস্থানীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারছেন না। তাই সহজে পাওয়া যায় এমন আসনে গিয়ে বসার চেষ্টা বা প্রতিযোগিতায় তাঁরা নিজেদের শ্রম ও মেধা খরচ করছেন।

এই একটি বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ। তাদের পুরুষতান্ত্রিক আচরণ এই জায়গায় নগ্নভাবে ধরা পড়ে যায়। সংবিধান সংশোধনের অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, দ্রুততম সময়ে সংশোধনের ঘটনাও ঘটেছে, কিন্তু নারীদের আসনের বেলায় যেন মনে হয় তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা করছেন। তাদের কলিজা ফেটে যাচ্ছে। তাই তাঁরা কোন মতেই নারী আসনের বিষয় নারীদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেবেন না। এই আসনগুলো দলের অধিকাংশ সদস্য বা পুরুষদের দ্বারা বা দলের প্রধান দ্বারা মনোনীত হতেই হবে। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্ন'র জাতীয় রাজনীতি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদর্শনের নির্লজ্জ খেলা হয়ে রয়েছে।

আমরা এখনো আশা ছাড়ছি না,তাই আবারও সরাসরি নির্বাচনের দাবী তুলে ধরতে চাই। এখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু পরিবর্তন হচ্ছে। বড় দুটি দলের আধিপত্য থাকলেও তরুণ প্রজন্মের অনেক জোট ও দল গঠিত হয়েছে। এই বছর ২০২৩ সাল বাংলাদেশের রাজনীতির জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর, কারণ ২০২৪ সালের শুরুতে দ্বাদশ সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আওয়ামী সরকারের জন্য এই নির্বাচন হতেই হবে। তারা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ক্ষমতায় থাকার জন্য একটি লোক দেখানো নির্বাচন করবে। অন্যদিকে বিএনপিকে ক্ষমতায় আসার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে গেলে পর পর তিন মেয়াদে এক নাগাড়ে ক্ষমতায় থাকার কারণে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বিগত দুটি নির্বাচন (নবম এবং দশম সংসদ) যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে তাতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই সরকারের অধীনে যৌক্তিক কারণেই আর কোন নির্বাচন করতে ভরসা পাচ্ছে না। জনগণও ভোট দিতে পারে নি, তাই জনগণও বিশ্বাস করতে পারছে না। সবার দাবী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের। কিন্তু এই সময় রাজনৈতিক যে ভয়ানক সংকট দাঁড়িয়েছে তাতে শুধু সুষ্ঠু নির্বাচন দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। তাই রাষ্ট্র সংস্কার, সংবিধান সংস্কার এমনকি একেবারেই নতুন করে সংবিধান রচনার প্রশ্নও সঙ্গত কারণেই উঠছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশকে নতুন ভাবে 'গঠন' করতে হবে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মূলধারা বিরোধী দল এবং প্রগতিশীল দল এবং জোট কেউই সংবিধানে নারী আসন সংক্রান্ত পুরুষতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক

পদ্ধতির বিরুদ্ধে কোন টুঁ শব্দটি করছেন না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূখায় সংরক্ষিত আসণ সম্পর্কে কিছু বলেনি, তবে জাতীয় সংসদে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে নারীদের প্রাধান্য দেয়ার কথা বলেছে। এর জন্যে সাধুবাদ জানাই। এটাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে কোন কথা না বলে নারী আন্দোলনের দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয়। এমন অবস্থায় নারী সংগঠন হিশেবে আমরা আগেও ভূমিকা রেখেছি এখনও তা অব্যাহত রাখছি। তারই একটি প্রয়াস এই গ্রন্থ।

এখানে সংরক্ষিত নারী আসন সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানে কি বিধান দেয়া আছে তা তুলে ধরা হয়েছে। নারী সংগঠনের সরাসরি নির্বাচনের দাবীর ইতিহাস এবং তা নিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য দেবার চেষ্টা করেছি। শুরু থেকে সরাসরি নির্বাচন নিয়ে যেসব দাবী দাওয়া উঠে এসেছে তার একটি খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও জোট সরকার এই আসন গুলো নিয়ে যা যা হয়েছে তার কাহিনী নানান লেখায় তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া নারী সংগঠনগুলোর দাবী দাওয়া বিশেষ করে সম্মিলিত নারী সমাজের সংগ্রামের কথা আছে।

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

ভোটাভুটি ও প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিতর্কিত একটি বিষয়। এই বিতর্ক আমরা বাংলাদেশে যতো তীব্রভাবে করতে পারব ততোই গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটবে এবং রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সেই তর্কবিতর্কের প্রতিফলন পড়বে। শুধু কথায় নয়, কাজেও। সেই বিতর্কে আমাদের অবস্থান পরিস্কার করছি। আমরা শুধু ভোটাভুটি বা নির্বাচনকে গণতন্ত্র বলে গণ্য করি না। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার জন্যে ভোট ও নির্বাচন একটি অপরিহার্য ব্যাপার। গণতন্ত্র তখনই চর্চা হয়, যখন রাষ্ট্রের ধরণ বা রূপ হিশাবে গণতন্ত্র বাস্তবে বিরাজ করে। চর্চাটা কিসের?

শুধু সংবিধানের কথাই ধরা যাক, রাষ্ট্র যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সংবিধান যদি গণতান্ত্রিক না হয়, যদি কিছু গণতান্ত্রিক নীতি সংবিধান কাগজে কলমে ধারণ করে কিন্তু রাষ্ট্রের মর্মে ও কাঠামোর মধ্যে যদি তার কোন উপস্থিতি বা প্রতিফলন না ঘটে, তাহলে নির্বাচনের কোন ফায়দা নাই। সেটা গণতন্ত্রহীনতাকে ন্যায্যতা দেওয়া ও বৈধ করা। সংবিধান যদি গণতান্ত্রিক দিক থেকে স্ববিরোধী,অসম্পূর্ণ কিংবা গণতন্ত্র বিরোধী হয়- তাহলে সেই রাষ্ট্রে

ভোটাভুটি বা নির্বাচন মাত্রই গণতন্ত্র – এই আখ্যা দেওয়ার অর্থ জনগণকে বিভ্রান্ত করা। সংবিধান সংস্কার করে গণতন্ত্র কায়েম করা যায় না। সমাজে যারা গণতন্ত্র বিরোধী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের দুষমন তারা একদিকে তাদের শাসন শোষণকে বৈধ করবার জন্যে এবং অন্যদিকে নিজেদের কলহ ও কোন্দলের মীমাংসা করবার তাগিদে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ক্ষমতা বৈধকরণের প্রক্রিয়া গণতন্ত্র নয়। এর সঙ্গে জনগণের গণতান্ত্রিক আকাংক্ষা ও সংগ্রামকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

অন্যদিকে যাঁরা নির্বাচন মানেই মন্দ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিক থেকে অর্থহীন, অতএব তা সদাই পরিহারযোগ্য মনে করেন, আমরা তাঁদের এই তুমুল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকেও সমর্থন করি না। ভোট দেওয়া ও নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়ম, আচার, সংস্কৃতি বা অভ্যাস গড়ে তোলাকে আমরা দরকারি কাজ বলে গণ্য করি। নির্বাচন ও প্রতিনিধি প্রেরণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন-সংগ্রামের বিকল্প হতে পারে না। অন্যদিকে একটি প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অকেজো থাকা বা দূরে থাকাও কোনো কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কাজ হতে পারে না।

এই দিকগুলো শুরুতে বলে রাখছি যাতে যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি তার মূল্যায়নটা সঠিকভাবে হতে পারে। সংসদে জনগণের প্রতিনিধি হিশাবে আমরা নারীকে কিভাবে দেখতে চাই সেই বিষয়েই এখানে আলোচনা।

জাতীয় সংসদে নারী -পুরুষ উভয়ে যেতে পারেন জনপ্রতিনিধি হয়ে। তার জন্যে তাঁদের নির্বাচন করে জনগণের ভোট নিয়ে যেতে হয়। জনগণের ভোট নিতে হলে সরাসরি তাদের কাছে যেতে হয়, সুখ-দুঃখের সাথী হতে হয়। তাদের নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থাকে, সেই জনগোষ্ঠির ভোট নিয়ে তাঁরা সংসদে বসেন। তবেই না জনপ্রতিনিধি! এ নিয়ে কোন বাধা নাই। তবে রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী কর্মীদের অবস্থান এতোই দূর্বল যে দল যদি কোন নারীকে সাধারণ আসনে মনোনয়ন না দেয়, তাহলে জীবনেও কোন নারী নির্বাচন করতে পারবে না। এমনটি ঘটছে দীর্ঘদিন ধরে, তাই সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে নারী অধিকার কর্মীরা স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু নারী আন্দোলন যখন দেখলো এই আসনগুলো নারীদের জাতীয় সংসদে আসার সুবিধা করে দিচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁর নিজের ক্ষমতা বলে কিছু থাকছে না – ফলে জনগণের প্রতিনিধি হবার সুবিধা থেকে নারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা সংসদে কেবল দলের টোকেন প্রতিনিধি হতে পারছেন

আর কিছু হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন কাজ। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বাড়তি বোনাস হচ্ছেন। যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায়।

তাই নারী আন্দোলনের দাবী আসন সংরক্ষিত যদি থাকে তা হতে হবে সরাসরি নির্বাচিত যেখানে রাজনৈতিক দলের নারী সদস্য, সমাজ কর্মী, নারী আন্দোলন কর্মী সকলেই নারীদের কথা বলার জন্যে এবং সার্বিকভাবে দেশের জন্যে কাজ করার সুযোগ পাবেন। একই সাথে এটাও বলা দরকার যে আজীবন নারী সংরক্ষিত আসনে থাকবে এটাও কাম্য নয়। নারীরা পুরুষের মতোই সাধারণ আসনে নির্বাচন করবে এটাই হচ্ছে লক্ষ্য। তাই সাধারণ আসনে নারীদের মনোনয়ন বাড়ানো কোন বিকল্প নাই।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন লেখায় সেই দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তারপরও আরো অনেক আলোচনা বাকি থেকে যাবে জানি।

যারা এই বইটি লিখতে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের নাম বলতেই হয়। সীমা দাস সীমু, সাইদা আখতার কুমকুম, রোকেয়া বেগম সব সময় পাশে থেকেছেন এবং ফরহাদ মজহার অনুপ্রেরণা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। সবকিছুর পরও ভুল বিস্তর থাকতে পারে, তাই আগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ফরিদা আখতার

১৫ জানুয়ারি ২০২৩

অধ্যায় এক

সংবিধান ও সংরক্ষিত নারী আসন

১৯৭১ সালে নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর ডিসেম্বর ১৬ তারিখে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিশাবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়েছে।

এই সংবিধানের পঞ্চম ভাগ হচ্ছে "আইনসভা"

৬৫। (১) 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রয়ণন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

৬৫। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা সমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৬৫। (৩) এই সংবিধানের প্রবর্তন হইতে দশ বছর কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

৬৫। (৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

সংরক্ষিত মহিলা আসন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান ধারাবাহিকভাবে দেয়া হোল।

১. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয় ১৫টি। এই আসনের নির্ধারিত মেয়াদ ছিল দশ বছর। প্রথম সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল ৭ এপ্রিল ১৯৭৩। সেই হিসেবে ১৫টি মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময় ছিল ১৯৮৩ সাল। এই ১৫ আসনে যারা মনোনীত হয়েছিলেন তাদের কোন দলের পরিচয় ছিল না।

২. পরবর্তী সময়ে The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1974 দ্বারা অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩)-এর সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ দশ বছরের পরিবর্তে পনের বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষিত আসন সংখ্যা পনেরটির পরিবর্তে ত্রিশটিকে উন্নিত করা হয়। ওই Second Proclamation পরবর্তী সময়ে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন,১৯৭৯ দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।

৩. দ্বিতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ২ এপ্রিল ১৯৭৯ থেকে ২ মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত। দ্বিতীয় সংসদে সংরক্ষিত ত্রিশটি মহিলা আসনে ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য ছিলেন। এঁরা সবাই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যের দ্বারা মনোনীত ছিলেন।

৪. তৃতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ১০ জুলাই ১৯৮৬ থেকে ১৩ জুলাই ১৯৮৭ পর্যন্ত। তৃতীয় সংসদে সংরক্ষিত ত্রিশটি মহিলা আসনে ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য ছিলেন। এই সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সংরক্ষিত ত্রিশটি মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ওই সময় সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। এই সময় জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় ছিল, যদিও তাদের নামের পাশে কোন দলের নাম লেখা ছিল না।

৫. চতুর্থ সংসদের মেয়াদ ছিল ২৫ এপ্রিল ১৯৮৮ থেকে ২৫ আগস্ট ১৯৯০ পর্যন্ত। কিন্তু তৃতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধন করে ত্রিশটি মহিলা আসনের মেয়াদ বর্ধিত না করায় চতুর্থ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ করা যায়নি। তবে চতুর্থ সংসদে সংবিধান (দশন সংশোধন) আইন,১৯৯০ দ্বারা ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে সংশোধন আনয়নের মাধ্যমে ত্রিশটি মহিলা আসনের মেয়াদ আবারো দশ বছর বর্ধিত করা হয়।

৬. পঞ্চম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ৫ মার্চ ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত। সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ওই

সংসদে যথারীতি ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য দ্বারা মনোনীত ছিলেন।

৭. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ১৬ মার্চ ১৯৯৬ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৯৬ পর্যন্ত। সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ওই সংসদে যথারীতি ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদস্য দ্বারা মনোনীত ছিলেন।

৮. সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ২৯ জুন ১৯৯৬ থেকে ১৩ জুলাই ২০০১ পর্যন্ত। সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ওই সংসদে যথারীতি ত্রিশ জন মহিলা সংসদ সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ শেষ হওয়ার পর পরই ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। সংবিধান সংশোধিত না হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায় নি।

১০. অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ২৮ অক্টোবর ২০০১ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০০৬ পর্যন্ত। এই সংসদে শুরুতে নারী আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় নি। ২০০৪ সালে চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়েছিল। এই ৪৫টি আসনে আনুপাতিক হারে সংখ্যাগরিষ্ট দল বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করেন ৪০ জন এবং পাঁচ জন ছিলেন জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্য জোটের প্রতিনিধি।

১১। নবম সংসদের মেয়াদ ছিল ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ – অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত। ২০১১ সালে ৪৫ থেকে বেড়ে তা ৫০ করা হয় এবং সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নারী সদস্য ছিলেন ৪৯ জন এবং বিএনপির ১ জন।

১২। দশম সংসদ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৪ - ৩ জানুয়ারি,২০১৯ । এই সংসদে ৫০টি নারী আসনে আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন ৪৩ জন, বিরোধী দল জাতীয় পার্টির ৬ জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির ১ জন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ১ জন।

১৩। একাদশ সংসদ ৩ জানুয়ারি,২০১৯ থেকে বর্তমান। এই সংসদে সংরক্ষিত আসনের ৫০ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪৩ জন, জাতীয় পার্টির ৫ জন, স্বতন্ত্র ১ জন এবং বিএনপির ১ জন। উল্লেখ্য বিএনপির

সংরক্ষিত আসনের সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ সালে পদত্যাগ করেন।

সংবিধান প্রণয়নের প্রথম অবস্থা থেকেই মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে এই প্রয়োজন সংখ্যা এবং মেয়াদের দিক থেকে কমেনি, বরং বেড়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালে এস সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত ১৫ থেকে ৩০ টি সংরক্ষিত আসনে মহিলারা পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর আসন সংখ্যা এবং মেয়াদ বেড়ে ৫০ আসন পর্যন্ত হয়েছে। অস্টম সংসদ থেকে নারী আন্দোলনের দাবীর কারণে একটু যা পরিবর্তন এসেছে তা হচ্ছে সংসদে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে আনুপাতিক হারে এবং বিশেষ করে বিরোধী দলকে কিছু আসন দেয়া হয়েছে মনোনয়নের জন্য। সংরক্ষিত আসন যেখানে সংখ্যাগরিস্ট দলের একছত্র আধিপত্য ছিল সেখানে তারা দয়া (?) করে সংসদে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দল, বিশেষ করে বিরোধী দলকেও দু'একটি আসন মনোনীত করতে দিয়েছেন, এটা তো ভাল বলতেই হবে। কিন্তু সেটাও তাদের নিজ নিজ দলের মনোনয়নের মাধ্যমে হচ্ছে, সরাসরি নির্বাচনে নয়।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে সংসদে বিরোধী দলের নারী আসনে একটি দুটি আসন দেয়া হলেও তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় নি। যেমন জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় পার্টি। একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) দু'জন সদস্য নবম এবং একাদশ সংসদে সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়া এবং একাদশ সংসদে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা জোরালো ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। এদের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে তারা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসলে তাদের কন্ঠস্বর আরও জোরালো হোত এবং তাঁরা আরো গঠনমূলক এবং ভাল ভূমিকা রাখতে পারতেন।

অধ্যায় দুই

নারী আন্দোলনের দাবী

সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচনের প্রশ্নে নারী সংগঠনের দাবী

জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি নারী আন্দোলনের একটি ইস্যু হিশাবে দীর্ঘ দিন ধরে এসেছে। নারীর সমধিকারের প্রশ্ন এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণকে তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সক্রিয়তা অত্যন্ত জরুরি, এই সাধারণ কথাটি নারী আন্দোলন তার দীর্ঘ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে। কোনো প্রকার ব্যবস্থা ছাড়াও পঞ্চাশ দশক থেকেই রাজনীতির বিভিন্ন অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে। ষাটের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক ব্যাপক ছিল। এইভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পুরো আশির দশকে নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেছে। নারীমুক্তির সংগ্রামে শুধু দু'একটি ছোটখাট দাবী পুরণ করলেই আমাদের মৌলিক অধিকার আদায় হবে না। তাই আশির দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের আন্দোলন এবং তাদের ১৭ দফা দাবীনামা।

ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের ১৭ দফা

আশির দশকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের পাশাপাশি নারী সংগঠন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় প্রথমবারের মতো বিভিন্ন নারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। নাম দেয়া হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ। সেই সময়ের সক্রিয় প্রায় সকল নারী সংগঠন এর সদস্য ছিল এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করে ১৯৮৭ সালে ১৭ দফা দাবী প্রণয়ন করে। এই দাবীনামা নীচে দেয়া হোল।

ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ

বাংলাদেশের নারী সমাজ নির্যতন, শোষণ ও বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। একদিন নির্যাতনমূলক সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধের

বিরুদ্ধে, আর অন্যদিকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়াশীল বৈষম্যমূলক দৃষ্টি ভঙ্গির বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের নারী সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, স্বৈরশাসনের অবসান ছাড়া-নারী নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করার উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ ও শাসননীতি ছাড়া নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠত হতে পারবে না। একই সাথে নারীসমাজ এটাও মনে করে যে নারীর সার্বিক সম অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। সেই জন্য নারী সমাজ স্বৈরশাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। এই লক্ষ্য থেকে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ১৭ দফা দাবীনামা প্রণয়ন করছে:

দাবীগুলো হচ্ছে:

১. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ এর দলিলে রাষ্ট্রীয় পূর্ণ স্বীকার চাই।

৩. যৌতুক নিষিদ্ধ নারী নির্যাতন বিরোধী যে সকল আইন বর্তমানে প্রণয়ন করা হয়েছে তা সংশোধনসহ বাস্তবায়ন চাই।

৪. বিবাহ,বিবাহবিচ্ছেদ সম্পত্তিতে সমঅধিকার ও সন্তানের অভিভাবকত্বে মায়ের অগ্রাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে ধর্ম ও মত নির্বিশেষে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'ইউনির্ফম সিভিল কোড' চালু করতে হবে।

৫. ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তির উইল করার অধিকার দিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৬. নারী পাচার বন্ধ করতে হবে। এফিডেভিড পদ্ধতি দ্বারা নারী পাচারের দালালদের অভিভাবক সাজা ও মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার সরকারি পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

৭. আইনগত প্রকৃত অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ পারিবারিক আদালত চালু করতে হবে।

৮. মেয়েদের জন্য গেজেট আসনে ১০% কোটা ১৫% এ উন্নীত করতে হবে। গেজেটেড নন গেজেটেড সকল ক্ষেত্রে কোটা নির্ধারিত চাকরি মেয়েদের দ্বারা অবিলম্বে পূর্ণ করতে হবে। জেলা ভিত্তিক কোটায় যদি যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অন্য জেলার মহিলা প্রার্থী দিয়ে সে আসন পূরণ করতে হবে। আদিবাসী ইত্যাদী ক্ষেত্রে চাকরির জন্য নির্ধারিত কোটার শতকরা ১৫% পদ আদিবাসী মহিলাদের দ্বারা পুরণ করতে হবে।

৯. গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন খেতমজুর মেয়ে ও শহরের বস্তিবাসী মেয়েদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. ক. গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের চাকরির নীতিমালা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে প্রণয়ন করতে হবে।

খ. আই এল ও কনভেনশন ভিত্তিতে শ্রমজীবী নারীদের অন্তঃসত্বাকালীন ছুটি ও অন্যান্য অধিকার প্রদান ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ. গৃহপরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে চাকরির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১১. পরিকল্পনা কমিশন বা অনুরূপ জাতীয় পরিকল্পনা সেলে এক তৃতীয়াংশ মহিলার নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. নির্যাতিত, নিগৃহীত, অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকহীন মেয়েদের জন্য শহর, গ্রাম সকল পর্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালিত পুনর্বাসন ও কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস, নারী জাতির প্রকৃত মর্যাদা দান ও মৌলিক মানবাধিকার প্রসংগে সর্বস্তরের পাঠ্যক্রম অন্তর্ভক্ত করতে হবে।

১৪. নারী সমাজের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আশু কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫. ধর্মীয় বা অনুরূপ অনুষ্ঠানে, সমাবেশে, সভা সমিতিতে সংবিধানে প্রদত্ত নারী অধিকার ও প্রগতি বিরোধী প্রচারণা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য করিতে হবে।

১৬. খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এনে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে হবে।

১৭. দেশ গঠনে সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সংসদে ও ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১৯৮৭ সালে প্রণীত ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের এই দাবিনামা সংসদে সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নে সরাসরি নির্বাচন সম্পর্কে প্রথম লিখিত এবং প্রচারিত দাবী। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজে সেই সময়ে ১৯ টি সংগঠনের মধ্যে বালাদেশ মহিলা সমিতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু মহিলা সমিতি একই সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাথেও যুক্ত ছিল, তাঁরা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে একমত হতে পারেননি বলে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ থেকে সরে দাঁড়ান। কারণ আওয়ামী লীগের অবস্থান তখনও পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে। তবুও একযবদ্ধ নারী সমাজ খুবই জোরালোভাবে এই দাবীটা সামনে নিয়ে আসে এবং নারী সংগঠনসমূহের মধ্যে এর ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। একই সাথে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের দাবীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিশাবে পরবর্তীকালে আন্দোলনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর বিভিন্ন সংগঠন তাদের নিজ নিজ সংগঠনের দাবীনামায় এই দাবীটা অন্তর্ভুক্ত করে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্বৈরশাসনের পতন একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পতনের সাথে স্বৈরশাসনের অবসান হয়। দেশে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়। একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই সময় ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সভানেত্রী খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে দাবী জানান, তাঁরা যদি সংসদে সংখ্যাতগরিষ্ঠতা লাভ করেন তাহলে যেন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য,এ পর্যন্ত দুটি দলই সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের মত বদলাননি। এবং সংবিধানের ৬৫(২) ধারার সুবিধা গ্রহণ করে নিজ দলের মহিলাদের মনোনীত করে ৩০টি আসনে বসিয়েছেন।

পায়রাবন্দ ঘোষণা: রোকেয়া দিবসে নারী সংগঠনের দাবী

নারী আন্দোলনের কাছে সংরক্ষিত আসনের গুরুত্ব মোটেও কমে যায়নি। তাদের আলোচনা, এবং দাবী প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ১৯৯৫ ছিল বিশ্ব নারী সম্মেলনের বছর। এর আগে বাংলাদেশ নারী সংগঠনগুলো নানা ধরণের প্রস্তুতিমূলক কাজ চালায়। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া ছিল পায়রাবন্দ ঘোষণা প্রণয়ন। আমরা জানি, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মস্থান রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। ১৯৯৪ সাল থেকে একটি প্রক্রিয়া শুরু হোল যেখানে বাংলাদেশের নারী সংগঠনের কর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মী, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের কর্মী, ছাত্র সংগঠনের কর্মী, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে একটি ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়। এই ঘোষণার নাম দেয়া হয়েছে পায়রাবন্দ ঘোষণা, কারণ নারীমুক্তির প্রশ্নে রোকেয়ার সংগ্রাম ও সারা বাংলাদেশের নারীর সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধতাকে একটি প্রতীকী নামে তুলে ধরার জন্যে পায়রাবন্দ ঘোষণা নামকরণ করা হয়েছে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নাগরিকদের পায়রাবন্দ ঘোষণা।

১৯৯৪ সালে কাজ শুরু হয় এবং পুরো একটি বছর সভা সমাবেশ করার পর ১৯৯৫ ডিসেম্বর মাসে ৯ তারিখে রোকয়ো দিবসে পায়রাবন্দ ঘোষণা চূড়ান্তরূপ আত্মপ্রকাশ করে।

পায়রাবন্দ ঘোষণার মোট ৩১টি ধারার মধ্যে ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে,

‘জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অপমানকজনক পদ্ধতির অবসান চাই’

ক. জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে হয় না, বরং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নে গিয়ে ঠেকে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেরাই নিজেদের মতো মহিলা সিটগুলোতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। আমরা মনে করি এই পদ্ধতি নারীদের জন্য অপমানজনক। আমরা অবিলম্বে এর অবসান চাই।

খ. ১৯৯০ সালে বিভিন্ন দল ও জোটের কাছে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের দাবী ছিল সংরক্ষিত সিটের সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৪ (জেলা হিশাবে) করা হোক এবং

তা হবে প্রত্যক্ষ ভোটে। সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার এই দবিতে আমরা সবাই একাত্মতা ঘোষণা করছি। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনের অন্যে রাজনৈতিক দলসমূহ আগামি নির্বাচনে যেন কমপক্ষে ১০% মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয় তার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

সম্মিলিত নারী সমাজের দাবী

১৯৯৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে ওঠে সম্মিলিত নারী সমাজ। আগষ্ট মাসের ২৪ তারিখে দিনাজপুরে পুলিশ কর্তৃক ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা ঘটনার প্রতিবাদে নারী সমাজের আন্দোলনমুখি ফোরামের জন্ম হয়। এর নাম হয় সম্মিলিত নারী সমাজ। তারা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, বিশেষত নারীর ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশব্যপী প্রতিবাদ, সংগ্রাম গড়ে তোলে।

এরই মধ্যে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসলো। তখন সম্মিলিত নারী সমাজের সদস্যরা দীর্ঘ আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের কাছে একটি দাবীনামা পেশ করে।

এই দাবীনামায় বলা হয়, নারীরা আজ ঐক্যবদ্ধ, আমাদের কাজ এগিয়ে চলছে সম্মিলিতভাবে। বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং ব্যক্তি সম্মিলিত হয়েছে একটি ব্যানারে সম্মিলিত নারী সমাজ নামে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এই সত্যটুকু সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা যেন উপলব্ধি করতে পারেন তাই দাবীর প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পেতে চাই।

মোট ১৭টি দাবীর মধ্যে তৃতীয় দাবী ছিল সংবিধান এবং জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত।

৩. সংবিধান ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ২৮ ধারায় নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে সম্পত্তি ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে নারীর ভাগ্য নির্ধারণকারী হিশাবে বহাল রেখে দেয়া হয়েছে ধর্মীয় আইন (Personal Law)। এটা সরাসরি সংবিধানের ২৮ ধারাকে লংঘন করে।

সংরক্ষিত নারী আসন বিষয়- এ সম্মিলিত নারী সমাজের দাবী:

১. সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে জেলা ওয়ারী ৬৪টি করতে হবে।

২. রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয়ার সময় ১০% মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হবে

৩. সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করতে হবে।

সংবিধানের দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সংশোধনী বাতিল করতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন, শত্রু সম্পত্তি আইন, রাষ্ট্র ধর্ম বিল অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

সকল স্তরে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানের আদিবাসী নারী সহ সংখ্যালঘু জাতিসত্তার গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থায় নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং সকল স্তরে সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। সপ্তম সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় হয়েছিল। তাই নারী সংগঠনগুলো তৎপর হয় এই বিষয়টি আলোচনা করার জন্যে। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ১৯৯৭ সালে বছরব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা পরিচালনা করে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় এবং গ্রামের নারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই সময়ে নারী সংগঠন এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সংসদে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক আলোচনা হয়েছে এবং নানা সংগঠন পদক্ষেপ নিয়েছে।

নারী সংগঠনসমূহের দাবী

নারী সংগঠনসমূহ চতুর্দশ সংশোধনীর সময় দাবী তুলেছিলেন,

এক: সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন এখনো আছে, ফলে সংসদে সাধারণ ৩০০ টি আসন ছাড়াও শুধু মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন রাখতে হবে।

দুই: সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ (ত্রিশ)টি যথেষ্ট নয়। ফলে এই আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। বর্ধিত সংখ্যা সম্পর্কে বহু মত থাকলেও প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকার জন্যে কমপক্ষে ৬৪ টি, কিংবা ৩০০ টি আসনের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১০০ টি করার প্রস্তাবের পক্ষে বহু সমর্থন পাওয়া গেছে।

তিন: সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচনের পদ্ধতি বিলুপ্ত করতে হবে। এই নির্বাচন হতে হবে জনগণের সরাসরি ভোটে। অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচন নয়, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে হতে হবে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয় নতুন সংশোধনীতে অবশ্যই আসতে হবে। তবে নারী সংগঠনগুলো ভবিষ্যতে সংরক্ষিত আসন তুলে ফেলার প্রক্রিয়া হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি দাবি তুলেছে যে প্রতিটি নির্বাচনে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০% মনোনয়ন দলের মহিলা প্রর্থীদের দিতে হবে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ নারী সংগঠনগুলোর দাবি:

১. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১০০ তথা এক তৃতীয়াংশে উন্নীত করতে হবে।

২. সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা পরবর্তী দুই টার্মের জন্য বহাল রাখতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৭ সালে। সে সময় জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে ব্যাপক নারী সংগঠনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছিল। এরপর ২০০৪ সালে জোট সরকারের সময় এবং ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় কিছু পরিবর্তন হয়। এর পর আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে পুণরায় প্রণয়ন করে।

৩২.৭ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে

নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা

৩২.৪ নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা

৩২.৩ রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার আলোচনা সভা

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে দাবীগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মাঠে ময়দানে সরব হয়ে ওঠা দাবী ছিল। জাতীয় সংসদে আলোচনার সূত্রপাত করার জন্যে এবং সংবিধানের সংশোধন কিভাবে করা হবে না হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরির লক্ষ্যে আগষ্ট, ১৯৯৬ থেকে নারীগ্রন্থ প্রবর্তনায় প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনা মূল বিষয়বস্তু ছিল জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে নারীদের দাবি কি হবে তা খোলামেলাভাবে আলোচনা করা। নভেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত মোট তিনটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভাগুলোতে খুবই খোলামেলা আলোচনা হয় এবং বহু নতুন তথ্য বেরিয়ে আসে। নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার এই আলোচনা অনুষ্ঠান অনেক নতুন ধারণা ও চিন্তার খোরাক যোগায়। এখানে সেই আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরা হচ্ছ।

প্রথম আলোচনা সভায় (১২ আগষ্ট, ১৯৯৬) সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংরক্ষিত রাখার পক্ষেই সকলে মত দেন। সংসদের সাধারণ আসনগুলোতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। শুধু মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তবে এ আসন সংখ্যা ত্রিশটি হবে নাকি আরো বাড়ানো উচিত সে ব্যাপারেও কিছু মতামত এসেছে। প্রস্তাব এসেছে জেলার সংখ্যা হিসেবে ৬৪ টি করার।

নারী আসন সংরক্ষিত থাকলেও বর্তমান নিয়মানুযায়ী পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের বিরোধীতা করেছেন সকলেই। এমনকি যাঁরা আগে একবার সংসদে সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরাও এ পদ্ধতিকে নিজেদের প্রতি সম্মানজনক মনে করেন নাই। শুধু তাই

নয়, দলের দিক থেকেও সদস্যদরে ক্ষমতা অনেক কম। ফলে তাঁরা এক ধরণের বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়েন। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনে শুধু মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংরক্ষিত আসন পূরণ করা হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় নারী-পুরুষ ভোটাররা এই আসনগুলোর জন্যেও ভোট দেবেন। অর্থাৎ ভোটাররা সাধারণ আসনের জন্যে একটি ভোট দেবেন এবং সংরক্ষিত আসনের জন্যে একটি ভোট দেবেন।

দ্বিতীয় সভা হয় ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬। এই সভায় স্থানীয় সরকার পর্যায়, যেমন ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই সভায় দুজন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন সরাসরি নির্বাচনে সাধারণ আসনের মেম্বর, অন্যজন সংরক্ষিত আসনের পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত। তাঁদের উভয়ের বক্তব্য ছিল সরসরি নির্বাচনের পক্ষে। পরবর্তী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আগে ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচনের দাবী তোলার জন্যে সকলে একমত হন।

তৃতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৬। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাংসদ এড: রহমত আলী। তিনি সরকারের স্থানীয় সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁর উপস্থিতিতে আলোচনা অনেক সমৃদ্ধ হয়। তিনি বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের আসনের গুরুত্ব এবং সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে যে সকল মতামত পেয়েছেন কমিশনের মাধ্যমে তা উল্লেখ করেন। তিনি জনপ্রতিনিধিত্বের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর পক্ষে আইন প্রণয়নের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

তিনটি সভাতেই মহিলাদের সরাসরি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে অর্থের সমস্যা এবং প্রচার কাজে অংশগ্রহণের সমস্যাগুলো বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। তবে সরাসরি নির্বাচন করার প্রয়োজনে এ বাধাগুলো কোনোমতেই প্রধান বাধা নয়। রাজনৈতিক দলগুলো সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনে রাজি হলে এ বাধাগুলো অনায়াসে দূর হতে পারে।

তিন সভার আলোচনা থেকে কয়েকটি প্রস্তাব:

প্রস্তাব এক: ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে সকল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজনীয়তা এখনো আছে এবং তা পরবর্তী মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত থাকবে।

প্রস্তাব দুই: সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বর্তমান পর্যায় থেকে বাড়াতে হবে। ত্রিশটি আসনের পরিবর্তে প্রতি জেলা হিসাবে ৬৪ আসন করতে হবে।

প্রস্তাব তিন: সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন নয়, সরাসরি নির্বাচন হতে হবে।

প্রস্তাব চার: মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষ উভয়ে ভোট দেবেন। তারা দুটি ভোট দেবেন, একটি সাধারণ আসনের জন্যে আর একটি সংরক্ষিত আসনের জন্যে।

প্রস্তাব পাঁচ: মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য শুধু মহিলারাই ভোট দেবেন। সেক্ষেত্রে মহিলারা দুটি ভোট দেবেন একটি সাধারণ আসনে, আর একটি সংরক্ষিত আসনে, আর পুরুষরা সাধারণ আসনের জন্যে একটি ভোট দেবেন।

প্রস্তাব ছয়: সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন ও সাধারণ আসনের সরাসরি নির্বাচন একই দিনে হবে।

প্রস্তাব সাত: সংরক্ষিত আসন ভবিষ্যতে যেন রাখতে না হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যে সাধারণ আসনে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এর জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী করতে হবে যেন; তাঁরা কমপক্ষে ১০% মনোনয়ন মহিলাদের দেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরো বাড়িয়ে শতকরা ৩০ ভাগ করতে হবে।

প্রতিটি জেলায় একজন করে মহিলা সাংসদ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, ৩০টি আসন হলে প্রতিটি জেলা থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকে না এবং সরাসরি নির্বাচন করতে গেলে মহিলাদের জন্যে নির্বাচনী এলাকা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে, কারণ প্রত্যেক সাংসদের জন্যে দুই কিংবা তার বেশি জেলা নির্বাচনী এলাকা হবে। তাই মহিলাদের পক্ষে সরাসরি নির্বাচনের জন্য প্রচার কাজ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে দুটি জেলা থেকে মাত্র একজন মহিলাকে মনোনয়ন দেয়া কঠিন হবে।

অন্যদিকে, ৬৪ টি আসন হলে অন্তত পক্ষে জেলায় একজন করে মহিলা আসবে। কিন্তু এতেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তারা বলছে, সাংসদদের মাধ্যমে উন্নয়নের যে কাজগুলো করা হয়, সেখানে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ এবং সাধারণ আসনের সাংসদ (মহিলা কিংবা পুরুষ)দের মধ্যে কাজের প্রতিযোগিতা হবে। প্রচলিত

নিয়মানুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলাদের নিজ এলাকার প্রতি কোনো জবাবদিহিতা নাই, কারণ জনগণ তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচন করেনি। এখানে সাধারণ আসনের সাংসদের একটা দায়িত্ব থাকে। তারা উন্নয়নের কাজগুলো করে তাদের নির্বাচনী 'ওয়াদা' পূরণের চেষ্টা করেন।

মনে করা হয়, মহিলা সাংসদরা শুধু মহিলাদের ইস্যুই ধরবেন। অন্য কোনো ইস্যু ধরার কোন দায়দায়িত্ব তাদের নাই কিন্তু এর আগে দেখা গেছে, মহিলাদের বিশেষ ইস্যু ধরতে গেলে সেটা দল কিংবা দলের পুরুষদের অপছন্দ হলে মহিলা সাংসদরা তা তুলতে পারেন না। বিএনপি আমলের সাংসদ ফরিদা রহমানের ঘটনা আমরা সবাই জানি। তিনি বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ বিল সংসদে আনতে পারেননি, তাঁর নিজেরই দলের পুরুষ সদস্যদের কারণে। শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনের সাংসদরা নারীদের ইস্যু নিয়ে কাজ করতে গেলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা সাধারণ আসনের সাংসদদের (যাদের অধিকাংশই এখনো পর্যন্ত পুরুষ) দয়ার ওপর নির্ভর করে উন্নয়নমূলক কাজ করেন নিজ এলাকায় জনগণের কাছে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হবার চেষ্টা করেন। যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, বা রাস্তা নির্মাণ, স্কুলের উদ্বোধন ইত্যাদি কাজ করছেন। এর বেশি কিছু করবার সুযোগ নাই। অথচ, সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এলে এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করার যে সকল প্রতিশ্রুতি তাঁর দল এবং তিনি নিজে দিয়েছেন তা পূরণ করলেও অনেক কাজ হবে।

মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের বিপক্ষে যারা বলেন তাঁরা একটি যুক্তি খাড়া করেন যে, মহিলারা নির্বাচনী প্রচারে গ্রামেগঞ্জে যেতে পারবেন না। বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এর জন্যে প্রয়োজনীয় খরচ মহিলাদের নাই। এই দুটি কথাই আপাতদৃষ্টিতে খুবই সত্য মনে হলেও আসলে তা ঠিক নয়। যে সকল মহিলারা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত আছেন, কিংবা যাদের স্বামীরা নির্বাচন করেছেন তাঁরা সকলেই নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন এবং তাঁদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। স্বামীদের জন্যে নির্বাচনী প্রচার করতে পারলে নিজের জন্যে করতে পারবেন না কেন? আর তাছাড়া অর্থের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে কি করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হয় সে চেষ্টাই মহিলারা করে দেখাতে চান। তাঁরা কালো টাকার প্রতিযোগিতায় নামতে চান না।

সংরক্ষিত আসনের পরিবর্তে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্যে প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও

কমিটমেন্ট। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংগ্রহণ করার সময় তাদের প্রধান লক্ষ থাকে কি করে সংসদে বেশি আসনে জয়ী হওয়া যায়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় আসনে জয়ী হবার সম্ভাবনা বিচার করেই প্রার্থী মনোনয়ন দান করেন। আজকাল দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্মীদের তুলনায় টাকা এবং মাস্তানের জোর আছে এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে আসন রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে। এই হিশাবে রাজনৈতিক দলগুলোতে অংশগ্রহণকারী মহিলারা সাধারণ আসনে মনোনয়ন পাওয়ার আশা করতে পারেন। তাদের ভাগ্য ভাল থাকলে, তাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে, ত্রিশজন হয়তো বা মনোনয়ন পেয়ে সাংসদ হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন। এর আগে, নারী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ১০% মনোনয়ন মহিলাদের দেবার দাবী করেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পায়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের আগে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী জানিয়েছিল। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে সম্মিলিত নারী সমাজ একই দাবী জায়ায়। এর কোনো প্রতিফলন ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মনোনয়ন আমরা দেখতে পাইনি। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মহিলাদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায় নি। শুধু বামপন্থি দলগুলো এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ক্ষমতায় যাবার চেয়েও এই দৃষ্টান্ত স্থপন করার দিকে বেশি আগ্রহী ছিলেন বলেই তা করেছেন।

প্রধান রাজনৈতিক দলের মহিলা অঙ্গসংগঠনগুলো সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে এখনো সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। তাঁরা সম্ভবত এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন যে সরাসরি নির্বাচন তাঁদের পক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে। কারণ তাঁদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আপনা থেকেই যেভাবে তাঁদের সাংসদ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, সরাসরি নির্বাচন করলে তা নাও হতে পারে। ফলে এই রিস্ক তাঁরা হয়তো নিতে চান না। কিন্তু একই সাথে আমরা এও দেখেছি যে মনোনয়নের মাধ্যমে যারাই এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা সাংসদ হবার গৌরব অর্জন করলেও তাঁদের মধ্যে এই অস্বস্তিবোধ কাজ যে দলের এবং দলের প্রধানের দয়ার ওপর নির্ভর করে সংসদে এসে পাঁচ বছর পুতুল হয়ে বসে থাকতে হয়।

নারী আন্দোলন তাই বিষয়টিকে কেবল রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সংসদে মহিলাদের আসনের যে রীতি শুরু হয়েছে তা

অব্যাহত রাখার দাবী উঠেছে শুধু একটি শর্তে, যে এই আসনগুলো সরাসরি জনগণের ভেটে নির্বাচিত হতে হবে। এভাবে নারীদের দাবী আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে সংসদে প্রথম ৩০ ভাগ আসন অর্জন করা এবং ৫০% আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করাই লক্ষ্য। এটা করতে হলে শুধু সংরক্ষিত আসনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, সাধারণ আসনে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিশাবেও দাঁড়াতে হবে। হার-জিতের তোয়াক্কা না করেই নির্বাচনী প্রচার এবং সকল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে।

প্রথম সংসদ থেকে সপ্তম সংসদ পর্যন্ত মোট ১৬৬ জন মহিলা সাংসদ হয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৮ জন একের অধিকবার সংসদে আসতে পেরেছেন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু প্রথম থেকে এই পর্যন্ত অনেকবার সরকার বদল হয়েছে, এবং রাজনৈতিক দল হিশেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রথমে ক্ষমতায় এসে পরে দলগঠন করেছে, সেকারণে এরপরের সংসদগুলোতে মহিলারা যাঁরা সংসদে যাবার জন্যে উদগ্রীব, তাঁরা দল পরিবর্তন করেছেন এবং সংসদের এই সংরক্ষিত আসনে একের অধিকবার যেতেও পেরেছেন। আর যারা কেবল স্বামীর পরিচয়ে কিংবা বিশেষ বিবেচনায় এসেছিলেন তাঁরা এখন হারিয়ে গেছেন। এঁরা শুধু বয়স বাড়ার কারণেই নয়, এমনিতেও সমাজে আর খুব বেশি সক্রিয় নাই। আমরা বেশ কিছু মহিলার খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করছি তাঁদের এখন যোগাযোগ করা কঠিন। খোঁজ নিতে গিয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে যেতে হচ্ছে, 'অমুক তো অমুকের খালা। দেখি তাঁকে জিগ্যেস করি উনি বর্তমানে কোথায় আছেন, ইত্যাদি'। সমাজে সক্রিয় থাকলে নিশ্চয় এভাবে খোঁজ করতে হয় না। এ পর্যন্ত যতোজন সংসদে সংরক্ষিত আসনে মনোনীত হয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে এখনো কোনো না কোনোভাবে চেনা যায়। স্থানীয়ভাবে যাঁদের নেয়া হয়েছিল, তাঁদের সম্পর্কে ঢাকায় বসে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না, তবে দুএকটি জায়গায় গিয়ে দেখেছি, তাঁরা খুব একটা সক্রিয় আছেন বলে মনে হয়নি।

নির্বাচনী এলাকা নির্ধারিত থাকলেও মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করার দিকে খুব বেশি চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। এ পর্যন্ত সাতটি সংসদের মধ্যে একটিতে ১৫টি আসনে এবং পাঁচটিতে মনোনয়নের মাধ্যমে ত্রিশটি আসনে যাদের আনা হয়েছে, তাঁরা সকল জেলার প্রতিনিধিত্ব করেননি। বেশ কিছু এলাকা বার বার প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে আর কোনো কোনো এলাকা কখনোই পায় নি।

অধ্যায় তিন

পত্রপত্রিকায় যা লিখেছি

হয় সরাসরি নির্বাচন দিন, নইলে সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন বিলোপ করুন

জাতীয় সংসদে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের কথা নিয়ে আজকাল সবাই একটু তৎপর হয়েছেন। আমরা সকলেই হয়েছি। কারণ আমাদের ভয় হচ্ছে কখন জানি সংসদের কোন একটি অধিবেশনে হঠাৎ করেই আইনমন্ত্রী বিল এনে ফেলবেন আর অমনি বিরোধী দলহীন অবস্থায় সংসদ দাপটের সাথেই পাশ করে ফেলবে এই বলে যে, দিলাম আরো ১০ বছর মেয়াদ বাড়িয়ে। এর অর্থ হবে যে নারী সংগঠনগুলো যা দাবী করছে তার কিছুই তারা শুনবে না, সরাসরি নির্বাচনের কথা তোলাই হবে না, শুধু আসন সংরক্ষণ, আসন সংখ্যাবৃদ্ধি এবং একই সাথে পরোক্ষ নির্বাচনের কথা আরও পাকাপোক্তভাবে পাশ হয়ে যাবে। এর জন্যে সংরক্ষিত আসনে যারা বসে আছেন তারাও টেবিল চাপড়ে স্বাগত জানাবেন। সরাসরি নির্বাচন না হয়ে পরোক্ষ নির্বাচন হয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হলে তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একেবারে পোয়াবারো। তারা সাধারণ আসনের বাইরে একসাথে ৬৪টি বাড়তি সিট পেয়ে যাবেন। বর্তমানে সংরক্ষিত আসনে যারা আছেন তাঁরা মনে মনে ভাববেন কোনভাবে যদি আওয়ামী লীগ আরো এক টার্ম কি দুই টার্ম নির্বাচনে টিকে যায় তাহলে তো তাদের জন্যে এই আসন পার্লামেন্ট হয়েই গেল। তাঁরা নিজেরা না হলেও তাঁদের দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ আছেন তাদের সম্ভাবনাও থাকবে। ফলে সংসদের ভেতর কোন প্রকার বিরোধিতার আশা আমরা করছি না। বিরোধী দল উপস্থিত থাকলেও কতখানি নারী সংগঠনের কথা তারা শুনবেন সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ সব রসুনের গোরাই তো একখানে।

নারী সংগঠনগুলো বহুদিন আলোচনা করে একমত হয়েছে এবং এর জন্যে পদে পদে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথাবার্তা বলেছে। এই কথা আগে আমরা বহুবার লিখেছি, এখনও বলছি, আমাদের দাবি আসলে একটাই।

সেটা হচ্ছে যদি আসন সংরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। নইলে এই আসনে আর সংরক্ষিত রাখার দরকার নাই আর আসন সংখ্যা বাড়াবার কোর প্রশ্নই আসে না। আমার মনে হয়, আইনমন্ত্রী এবং সংসদীয় কমিটির কাছে আমাদের এই দাবীই তোলা দরকার হয়ে পড়েছে যে আপনারা যদি সরাসরি নির্বাচনের চিন্তা বাদ দিয়ে থাকেন তাহলে আর কষ্ট করার দরকার নাই। এই বার মেয়াদ শেষ হলে এই আসনগুলো শেষ হয়ে যাক। এই আসনগুলো ধরে রাখার আর কোনই দরকার নাই। এটা এখন আমাদের সাফ কথা। কারণ আমরা দেখছি, বারবার নারী সংগঠনগুলোর সাথে সংসদের নারীদের পক্ষে বিল আনার ক্ষেত্রে প্রতারণা করা হচ্ছে। নারীর অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে নারী সংগঠনগুলোর দৃঢ় মনোভাব এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের উদ্বিগ্নতার সুযোগ নিয়ে তারা নানা সময় মতবিনিময়, দেখা-সাক্ষাৎ করতে চাইলে দেখা করছেন এবং বলছেন এটা ভাল প্রস্তাব, কিন্তু কাজ করার বেলায় যা তাঁরা নিজেরা মনে করছেন তাই করছেন। আমরা এখন এই প্রক্রিয়ায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছি। যে কাজ আন্দোলন করে আদায় করতে হবে সে কাজ মিষ্টি কথা এবং টেবিল বৈঠকে হবে না এই কঠিন সত্য বুঝতে আমাদের আর বাকি নাই। সম্মিলিত নারী সমাজসহ আরো অনেক নারী সংগঠন যারা এ নিয়ে কাজ করে আসছেন তাদের এখন রাস্তায় নামার সময় হয়ে আসছে। সরাসরি নির্বাচন ঠেকিয়ে তারা নারীদের রাজনৈতিক পথে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে, তাহলে এখানে সংসদের সাধারণ আসনের নির্বাচনেরই বা আর দরকার কি? তারাও মনোনীত হয়ে আসেন না কেন? নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাস, বোমাবাজি, খুন-খারাবি এবং সর্বোপরি বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়। এই নির্বাচন করে সংসদে গিয়ে কি আর জনপ্রতিনিধি হওয়া সম্ভব? একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি: সম্প্রতি একটি এলাকায় একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার এলাকার চিহ্নিত এক সন্ত্রাসীকে তার কৃত অপরাধের কারণে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হতে দেখা গেছে। কারণ হিশেবে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'সামনে আমার নির্বাচন, কাজেই তাকে কিছুতেই গ্রেফতার করা যাবে না'। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন, এই সন্ত্রাসীর জোরেই তিনি নির্বাচনে জিতবেন, জনগণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে কি নাই তার জন্যে তিনি মোটেই চিন্তিত নন। তবে যারা সত্যিকারের জনগণের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ খবর রাখেন। তবেই না জনপ্রতিনিধি হিশেবে দাবী

করতে পারেন। তখন সংসদে গিয়ে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে বসলে তাঁকে মানায়।

সংরক্ষিত আসন নিয়ে তাহলে এ কিসের খেলা চলছে?

আমরা চাই বা না চাই, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল সংসদে উঠতেই হবে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জেনেছি, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিলটি গত বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ১১ অক্টোবর মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। কিন্তু এখনও সংসদে তা উত্থাপিত হয় নি। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সংসদে যোগদানে বিরত থাকার কারণে এই বিল পাশ হওয়ার সম্ভাবনাও আপাতত নাই। এই সংশোধনের জন্যে সংবিধান অনুযায়ী সংসদের দুই-তৃতীয়ায়শ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন। কাজেই বিরোধী দলের উপস্থিতি ছাড়া সংশোধন করা যাবে না।

সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়ানোর আগ্রহের অভাব নাই। ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দল উভয়েই এটা চায়। আবার এটা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা শুরু হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে। এখন সংসদ বলতে গেলে খালি। দুই তৃতীয়াংশ সদস্য দূরে থাকুক এক তৃতীয়াংশ পাওয়াই দুষ্কর। বিরোধী দল সংসদে না থাকার জন্যেই মনে হয় নির্বাচিত হয়েছিল, আর সরকারি দল মনে হয় বিরোধী দলকে সংসদে বসে গালাগালি দেয়ার জন্যে জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে। তাদের ভাবখানাই এমন, ওরা সংসদে বসলেই আমরা গালি দেবো আর সরকারি দল মনে হয় বিরোধী দলকে সংসদে বসে গালাগালি দেয়ার জন্যে জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে। তাদের ভাবখানাই এমন, ওরা সংসদে বসলেই আমরা গালি দেবো আর সংসদ থেকে বাইরে চলে গেলে আলোচনার আহবান জানাবো- এই হচ্ছে সরকারি দল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে আমরা এমনই এক ক্যারিকেচারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সরকারি দল আওয়ামী লীগ বিরোধী দল বিএনপিকে সংসদে আনতে পারছে না। এই অবস্থায় সংরক্ষিত আসনের বিলটা একটা টোপের মতো কাজ করবে বলে অনেকেই মনে করেন। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে যেসব লেখালেখি হচ্ছে তাতে দেখা যায় অনেকেই মনে করছেন, সংসদ বর্জনরত বিএনপি মহিলা আসনের মেয়াদ বাড়ানোর বিল নিয়ে বেকায়দায় পড়বে। সংসদে তাদের উপস্থিতি সমর্থন ছাড়া এ বিল পাশ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সংসদে এসে এ বিলে সমর্থন না জানালে

তারা মহিলা ভোটারদের আস্থা হারাতে পারে। আবার সংসদে এলে সেটা হবে সরকারের একটি রাজনৈতিক বিজয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এতোদিনে তাদের এই বোধটুকু জেগেছে যে সংসদের সংরক্ষিত আসনের সাথে শুধু নারী সংগঠনের কর্মীদেরই নয়, মহিলা ভোটারদেরও বুঝি একটা সম্পর্ক আছে। নির্বাচন যতো কাছে ঘনিয়ে আসছে ততোই তাদের চোখের আয়নায় ভোটারদের চেহারা ভাসতে শুরু করছে। এই আয়নায় তারা দেখতে পাচ্ছে যে ভোটারদের মধ্যে ৫০% হচ্ছে নারী এবং ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা আসনগুলো সরাসরি নির্বাচন হওয়া কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষও সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন। এটা বলার কোন দরকার নাই যে গ্রামের সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কিছু চিন্তিত নন, কারণ তারা এটার মর্ম বোঝেন না বরং আমরা উল্টোটাই দেখেছি, গ্রামের মহিলাদের কাছে যখনই বিষয়টা উপস্থাপন করেছি, তারা ঠোট উল্টে ব্যঙ্গ করে বলেন, আমরা যদি গ্রামে সরাসরি নির্বাচন করতে পারি তাহলে আপনারা শহরে পারবেন না কেন?

সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়েরই স্বার্থ এখানে এক জায়গায় মিলে যাচ্ছে যে তারা মেয়াদ বাড়াতে চায়, আসন সংখ্যা বাড়ালে নারী সংগঠনের চেয়ে তাদেরই লাভ বেশি, কিন্তু সরাসরি নির্বাচন দেয়ার বেলায় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের মধ্যে (তাদের অধিকাংশই পুরুষ) আচরণ এমন যে তারা যেন মহিলাদের গার্জিয়ান। তারা ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছেন কী করে মহিলারা সরাসরি নির্বাচনের জন্যে খাটাখাটনি করবে। এতো কষ্ট মহিলাদের সইবে না, এতো টাকা তারা পাবে কোথায়, মাস্তান ছাড়া তো নির্বাচন হয় না, তাহলে মহিলারা তো কোনমতেই জিততে পারবে না, এই রকম হাজারো প্রশ্ন করে মহিলাদের এই দাবীকে তারা হাল্কা করে দেয়। মনে হয় নির্বাচনের ব্যাপারটা এতোদিন তারা একাই করেছেন। মহিলারা স্বামীর নির্বাচনের জন্যে, বাবা-ভাইয়ের নির্বাচনে যেভাবে সক্রিয় থাকে সেখানে আর প্রমাণ করতে বাকি কোথায় যে নির্বাচনী প্রচারে মহিলারা কত অভিজ্ঞ!

এদিকে সংসদে সংরক্ষিত আসন নিয়ে কিছু না কিছু করতে তো হবেই। হয় মেয়াদ বাড়াতে হবে, নইলে আসনগুলোকে বিলোপ করে দিতে হবে। সরকারি দল এবং বিরোধী দলের জন্যে সহজ কাজ হচ্ছে শুধু মেয়াদ

বাড়িয়ে দিয়ে চুপ করে থাকা। কিন্তু তাহলে আমরা নারী সংগঠনরাও কি চুপ করে থাকবো? রাজনৈতিকভাবে নারীদের সক্রিয়তার প্রমাণ তাহলে আমাদের এই বিলের বিরুদ্ধে কাজ করেই দিতে হবে। এবং এক খেসারত তারা দেবেন আগামি নির্বাচনে। নারী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে, ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দলের নারী-বিরোধী চরিত্র উন্মোচন করে দেবে। যে নির্বাচনী প্রচারণা সরাসরি নির্বাচনের জন্যে হওয়ার কথা ছিল সেটাই ব্যবহার হবে এদের মুখোশ খুলে দিতে।

আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বহীনতা

এর আগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিলের ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের নেতিবাচক ভূমিকা আমরা দেখেছি এবং তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছি। নারীদের নিয়ে আইন হচ্ছে অথচ নারী সংগঠনগুলোর দেয়া প্রস্তাব তারা নিয়ে সেটাকে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরা যা চান তাই করেন। কোন লাভ হোল না এতো সময় দিয়ে তাদের। আমরা মনে হয় এরপর থেকে আইন মন্ত্রণালয় অন্তত মহিলাদের দেয়া উচিত। হয়তো তাতে কিছুটা সমাধান হতে পারে।

সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত বিল নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের যা করার কথা তারা এখনও তা করেন নি। মন্ত্রী পরিষদে মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাবটি অনুমোদন করার পরেও আইন মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে মহিলাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদে আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদি, এটাকে স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা যেন পরীক্ষা করে দেখা হয়। এ বিষয়টির যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো হয় নি। রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে মতবিনিময়ও সম্পন্ন হয় প্রস্তাবটি অনুমোদন করার পরেও আইন মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে মহিলাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদে আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদি, এটাকে স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা যেন পরীক্ষা করে দেখা হয়। এ বিষয়টির যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনো হয় নি। রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে মতবিনিময়ও সম্পন্ন হয় নি। তাই সর্বসম্মত উদ্যোগেরও সুযোগ তৈরি হয় নি। বিভিন্ন মহল থেকে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবী

উঠলেও সে ব্যাপারে কোনো অভিমত দেয় নি আইন মন্ত্রণালয়। (আজকের কাগজ, ২০/৪/২০০০)

সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি জটিল হয়ে উঠছে

সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন'। (সংবিধানের ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধনী)

১৯৯০ সালের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদ গঠিত হয় ১৯৯১ সালে। সে সংসদের প্রথম বৈঠক বসে ৫ এপ্রিল ১৯৯১। সে হিশেবে ২০০১ সালের ৪ এপ্রিল মেয়াদের ১০ বছরকাল পূর্ণ হবে। ওই দিন পর্যন্ত যে সংসদ থাকবে তা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলা আসনের মেয়াদ থাকবে।

বর্তমান জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২০০১ সালের ১৪ জুলাই। সুতরাং এ সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করলে এর পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী আর সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকবে না। কিন্তু ২০০১ সালের ৪ এপ্রিলের মধ্যে সংসদ নির্বাচন (মহিলা আসনসহ) সম্পন্ন হলে সে সংসদে মহিলা আসন থাকবে এবং ওই সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

এদিকে, সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ ভেঙে যাবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। আবার সাধারণ নির্বাচনের পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন করতে হবে। সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশ ও শপথ গ্রহণের পরে মহিলা আসনের নির্বাচন করতে হয়। (আজকের কাগজ, ২০/৪/২০০০)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ৪ এপ্রিলের আগে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হবে কি না আর হলেও মহিলা আসনের নির্বাচন তার আগে সম্পন্ন হবে কি না। যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকতে পারবে না। কারণ সংবিধান অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ অর্থাৎ ৪ এপ্রিলে যে সংসদ থাকবে

সে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলা সংরক্ষিত থাকবে। তাই মহিলা আসনের জন্যে ২০০১ সালের ৪ এপ্রিলের মধ্যে গঠিত সংসদ থাকতে হবে।

এখন দেখা যাচ্ছে আগামি সাধারণ নির্বাচন কখন হচ্ছে এবং সময়মতো সংসদ গঠন করছে কি না তার ওপর সংরক্ষিত আসনের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। কিন্তু সংবিধান বিশেষজ্ঞরা যতোই বলুন না কেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতিগতি নিয়ে চলছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এক এলোমেলো অবস্থায় সকল দলই তড়িঘড়ি করে সংবিধানের সংশোধনী আনার চেষ্টা করবে। আমাদের ভয় হচ্ছে তখন ভালর চেয়ে মন্দই হবে বেশি। তার চেয়ে সহজ কাজ ছিল এখনই যদি সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাবটা মেনে নেয়া তাহলে এই সংসদ গঠনে নারী সদস্যদের ভূমিকাও প্রত্যক্ষ হবে। আর তা না হলে ৩০০টি সাধারণ আসনের নির্বাচনের পর তাদের অপেক্ষা করতে হবে পরোক্ষ নির্বাচনের জন্যে।

[ভোরের কাগজ, ১৩ মে, ২০০০]

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কি সংরক্ষিত আসনের গার্জেনের ভূমিকায় নেমেছে?

সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নে নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে ঐকমত্য আছে সেটা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন হতেই হবে। এখানে কোনো ভিন্নমত নাই। তবে, এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারিত হবে না অনির্ধারিত হবে, তা নিয়ে কারো কারো ভিন্ন মত আছে। সম্মিলিত নারীসমাজ এবং আরো অনেক সংগঠন মনে করে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে এবং আসন মেয়াদী হতে হবে।

এটা এখন বোধহয় কারো আর নতুন করে বোঝার বিষয় নয় যে সংসদে যে ত্রিশটি আসন আছে তা এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছে। মুমূর্ষু অবস্থায় রোগী সম্পর্কে যেমন একটি সময় বেঁধে বলে দেয়া হয় এতো দিন বাঁচবে ঠিক তেমনি সংরক্ষিত আসনের মৃত্যুর দিন সম্পর্কে সবার জানা আছে। সংবিধান অনুযায়ী এর আয়ু আছে ২০০১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এখন ভেনটিলেটর মেশিন দিয়ে রাখা আছে, গার্জেনরা যখনই সিদ্ধান্ত নেন তখনই এই মেশিন খুলে ফেললে সে আপনাতেই চোখ বুজবে, আর নেহাত যদি

কোনো আলৌকিক শক্তি এসে তাকে এই 'কোমা' অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে তাহলে সে বেঁচেও যেতে পারে। সবই উপরওয়ারার ইচ্ছা।

সংসদের সংরক্ষিত আসনের গার্জেন কারা? বর্তমান অবস্থায় যেহেতু এটা সংবিধানের সংশোধনের প্রশ্ন, তাহলে সংসদে যারা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে বসে আছেন বলে আমরা জানি তারাই এখন এই আসনের গার্জেন। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এই আসনগুলোর জীবনে রক্ষা করতে পারবে কিংবা একে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। সরকারি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি প্রধান দুটি গার্জেন যারা পরস্পর অন্তত এই একটি বিষয়ে একমত না হলে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হবে না। অতএব, সংবিধানের ৬৫ নং ধারায় মৃত্যু ঘটবে এবং এর পর থেকে সংসদে মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসন বলে আর কিছু থাকবে না। তখন ৩০০টি সাধারণ আসনে মহিলারা পুরুষদের মতোই নির্বাচন করে আসতেও পারেন নাও আসতে পারেন। সংসদ একেবারে মহিলা শূন্য হয়ে যাবারও সম্ভাবনা আছে, কারণ রাজনৈতিক দলগুলো সহজে মহিলাদের মনোনয়ন দিতে চান না। আবার তারা যদি একটু উদার হন তাহলে দু'একজন আসলেও আসতে পারেন। বেশ লাগবে তখন সংসদ দেখতে। বাংলাদেশের বাস্তবতা দেখার এমন সুযোগ এখন তো আমাদের হচ্ছে না। তবে এতটুকু জানি যে সংসদ একেবারে মহিলা শূন্য হবে না কারণ দু'টি প্রধান দলের দুইজন নেত্রী নির্বাচনে অবশ্যই জয়ী হবেন, তাছাড়া আরো কয়েকজন ইতিমধ্যে সাধারণ আসনে এসে পড়েছেন, তাঁরা তাদের নির্বাচনী এলাকা তৈরি করতে পেরেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এতো সুবিধাই ভোগ করেছেন, কিন্তু এখন যখন তাদের ভূমিকা পালনের সময় এসেছে তখন দুটি দলেরই স্বরূপ বেরিয়ে আসছে। তারা এই আসনগুলোকে তাদের বোনাস আসন ছাড়া অন্য কোনোভাবে ভাবতে এবং ছাড় দিতে রাজি নন। তাই তাঁরা নারী সংগঠনগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী তুড়ি মেপে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন। নারী সংগঠনগুলো দাবী করছে, আসন সংরক্ষিত থাকুক কিন্তু তা হতে হবে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। এই আসনগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন বা মনোনয়নের পদ্ধতি নারী সংগঠন নাকচ করে দিয়েছে বহু আগে। এই প্রসঙ্গে ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে আসন সংখ্যা বাড়ানোর কথা এসেছে আর সবচে' বড়ো কথা আসন সংরক্ষণের বিষয়টিও এসেছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। অনির্দিষ্ট

কাল আসন সংরক্ষিত থাকুক এটা কেউ চায় না। নারীরা তাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় করে তুলে ৩০০টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠছেন। সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছিলো নারীদের স্বার্থে, কিন্তু এর মালিকানা চলে গেছে রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে। তারা এই আসনগুলোকে অবহেলিত কন্যার মত ব্যবহার করছেন। এটা জানা কথা, কন্যা সন্তানকে জন্ম থেকেই অবহেলা করা হয় এবং সমাজে কোনদিন মর্যাদা দেয়া হয় না। মর্যাদার জন্যে তাকে সংগ্রাম করতে হয়। অথচ বিপদের সময় তাদেরই কাজে লাগে। এই আসনগুলো যতোই আত্মীয়-স্বজন দিয়ে ভরানো হোক না কেনো, দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই কন্যাদের ভূমিকা কম ছিলো না।

আইনগুলো পাস করতে গিয়ে তাদের সমর্থন কাউন্ট করা হয়েছে। অথচ তারা মনোনয়নের মাধ্যমে আসছে বলে কখনোই তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়নের সময় যোগ্যতার চেয়ে আত্মীয়স্বজন, কিংবা কাউকে বিশেষ সুবিধা দেয়া কিংবা লবিংয়ের মাত্রা, এসব বিবেচনা করে দেয়। আর পরে বলে 'দেখেন, এরা তো আসলে কোনো কাজ করতে পারে না। এদের যোগ্যতাই নাই।' আবার মহিলা আসনের সাংসদ হিসেবে যারা একটু আন্তরিকভাবে নিজ এলাকায় কাজ করেন তাদের বলা হয়, এই নির্বাচনী এলাকা তার ভাইকে দিলে নির্ঘাত জয়ী হতে পারবে। কারণ তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে [এই কথা আমি একটি সভায় একজন মহিলা সাংসদের মুখে শুনেছি। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নাম দিতে চাই না, তবে কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে ব্যবহার করলাম]। অর্থাৎ কাজ করলেও নির্বাচনী এলাকা তৈরি হয় না কারণ তার তো কখনোই জনগণের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপার নাই। জনগণও এটা জানি। কাজেই তার জনপ্রিয়তাকে তার ভাইয়ের জন্যে ব্যবহার করার কথা ভাবছে। আমরা দেখেছি মহিলা আসনের প্রায় প্রত্যেক সাংসদরা বুঝতে পারেন তাদের মর্যাদা কিভাবে পদে পদে ক্ষুন্ন হয়। একটু মন খুলে কথা বলতে গেলেই তারা অকপটে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু দলের আনুগত্য দেখাতে বাধ্য বলে খোলামেলাভাবে এই কথা অনেকেই বলতে পারেন না।

এখন এই অবহেলিত কন্যার দু'জন 'গার্জেন' দু'রকম ভূমিকা পালন করছে। একজন সরকারি দল (আওয়ামী লীগ) এখন জাঁদরেল শ্বশুরবাড়ির ভূমিকায় নেমেছে। সংসদ এখন তাদের হাতে। তারা যখন ইচ্ছা বিল আনতে পারে এবং যেকোনভাবেই বিল আনতে পারে। এই কন্যাদের ব্যাপারে বড়ো

সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যখন অন্যপক্ষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন তা সত্তে ও তারা তাদের সঙ্গে বৈরী আচরণ করেই যাচ্ছে। ওরা রাগ করে সংসদে আসছে না, বলছে পরিবেশ ভালো না হলে আসবো না। তাতেও আওয়ামী লীগের কিছুই যেনো যায় আসে না কারণ সংসদ এখন তাদের হাতে। আর কন্যাদের ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নাই। তারা ভাবছে আগামী নির্বাচনে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনমতে পেয়ে গেলেই তো এই আসনগুলো অটোমেটিকভাবে তাদের হয়ে যাবে। আবার অন্যদিকে বেরোধী দল (বিএনপি) নেমেছে কন্যার এমন এক গার্জেন হিসেবে যার সিদ্ধান্তের করণে কন্যার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে জেনেও তারা কোনপ্রকার ছাড় দিতে রাজি নয়। আমি তাদেরকে কন্যার বাপের বাড়ির পক্ষ বলছি না এই জন্যে যে তাদের আচরণও এই শ্বশুরবাড়ির মতোই। তারা কন্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্যেই তাদের গোঁয়ারতুমি করেই যাচ্ছে। তাদের হিসাবও আছে যে যদি বাইচান্স সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েই যাই তাহলে তো এই সিট আমাদের হবার কথা। এখন সরাসরি নির্বাচন দেয়ার মানেই হচ্ছে এমন অনেক মহিলা এখানে চলে আসবে যারা তাদের রাজনৈতিক দলের নাও হতে পারে। এখানেই তাদের ভয়। সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা তারা বেমালুম ভুলে বসে আছে। তারা ভাবছেন সংসদে সব সময়ই একটি সরকারি দল এবং একটি বড় বিরোধী দল হিসেবেই থাকবে। বাকি দু'একজন অন্য দল থেকে থাকলেও এমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর ত্রিশটি বাড়তি একসঙ্গে পাওয়ার লোভ তারা কেউই সামলাতে পারছে না। আর ত্রিশটি বাড়তি একসঙ্গে পাওয়ার লোভ তারা কেউই সামলাতে পারছে না। তাই এটা তাদেরই হাতে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠছে। অথচ খুব সহজভাবেই তারা একটু অন্যভাবেও ভাবতে পারতেন। ঠিক ৩০০টি আসনে তারা যেমন মনোনয় দেন তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো মহিলা আসনেও যোগ্যপ্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে এই আসনের সিংহভাগ তাদের হাতে নিয়ে নিতে পারতেন। ৩০০টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও নারী আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো দলের হয়েও যেতে পারতেন। তাহলে সেটাও কি তাদের লাভ ছিলো না?

যতো বড়ো রাজনৈতিক দলই হোক না কেনো, কখনোই এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা পায় না যে সংসদে জাঁকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘোষণা করে সরকার গঠন করবে। ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে কোনোমতে ১৫১টি আসন পেলেও আপনা থেকেই সরকার গঠন করা যায়। কিন্তু সেটাও

বিএনপি আওয়ামী লীগ কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না যে তারা পাবে। এদিক সেদিক করে শেষ পর্যন্ত সরকার গঠন করে এবং অন্য দলের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কারণে মহিলাদের জন্যে রাখা ৩০টি সংরক্ষিত আসন তারা বোনাস হিসেবে বাগিয়ে নেয়। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই বাগিয়ে নেবার কাজটি তাদের বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই কোনো রাজনৈতিক দলই এই আসন নিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চায় না।

আজকাল বেশ কয়েকটি সভায় আমি যোগদান করে দেখেছি, সরকারি দল এবং বিরোধী দলের পুরুষ সাংসদ এবং মন্ত্রীরা আমাদের কয়েকটি কথা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন। আমি কারো নাম উল্লেখ না করে সেই কথাগুলো তুলে ধরছি। যিনি বলেছেন তিনি যদি এই লেখা পড়েন তাহলে নিজেই বুঝে নেবেন। নাম উল্লেখ না করে, এই কথাগুলো তুলে ধরার কারণ হলো-আমার মনে হয়েছে এই কথা তাদের একার কথা নয়। এই কথা হয়তোবা আরো অনেকের তাই তাদের নাম উল্লেখ করে তাদেরকে বিব্রত করতে চাই না। তারা বলেছেন, 'আপনারা যা বলছেন তা কখনোই সম্ভব নয়। নারীরা পুরুষদের আসন কেড়ে নিচ্ছে এটা পুরুষরা কখনোই মেনে নেবে না। এটা পুরুষদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। পুরুষরা কখনোই ছেড়ে দেবে না।' আবার বলেছেন, 'একটু ভেবে দেখুন, আমরাই টাকা ছাড়া নির্বাচন করতে পারি না, সন্ত্রাস ছাড়াও নির্বাচন হয় না। মহিলারা কিভাবে এতো টাকা পাবে? আর সন্ত্রাস?' বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের পুরুষ নেতারা নাকি নারী সংগঠনগুলোর এই দাবী সম্পর্কে অবগত নন এবং জানার জন্যে খুব একটা গা করেন না। যখন প্রস্তাব দেয়া হলো যে যেহেতু সংবিধানের সংশোধনীর জন্যে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট লাগবে তাহলে আমরা ৩০০ জন সাংসদের কাছে গিয়ে লবি করবো, তাদেরকে বোঝাবো। তখন দু'টি দল থেকে প্রায় একটি অভিন্ন উত্তর আসে। তা হচ্ছে, 'আমাদের কাছে এসে সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা দুই নেত্রীকে কনভিন্স করতে পারলে সব হয়ে যাবে।' অর্থাৎ দু'টি দলের পুরুষ নেতারা আমাদের বলে দিচ্ছেন তাদের দলের মধ্যে কোনো গণতান্ত্রিক চর্চা নাই। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা কি মনে করে সেটা দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। সিদ্ধান্ত হয় একমাত্র হাসিনা এবং খালেদার ইচ্ছা-অনিচ্ছা দিয়ে। এই কথা এতো প্রকাশ্যে তারা বলেন যে ভাবতে অবাক লাগে, কি করে তারা রাজনীতি করেন বলে দাবী করেন। এই কথা বলার মধ্য দিয়ে নারীদের দাবীর প্রতি তাদের তাচ্ছিল্য ও ধরা পড়ে। এবং দুই নেত্রীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিজেরা কোনো

দায়িত্ব নিতে চান না। আমরা সরাসরি দুই মাননীয় নেত্রী, হাসিনা এবং খালেদার কাছে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই-আসলেই কি নারীদের দাবী মানা না মানা নিয়ে আপনাদের কিছুই এসে যায় না? আপনারা কি জানেন যে এবার এই বিষয়টি একটি বড়ো ধরনের নির্বাচনী ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে? তখন এই দু'টি দলকেই তাদের দায়িত্বহীনতার জবাবদিহি করতে হবে। আপনারা জনগণকে আর কখনোই কেযঅর না করলেও অন্তত ভোটের সময়তো করতেই হবে। ভোটারের মধ্যে ৫০% নারী আছেন, এই কথাও আপনারা জানেন। আগামী নির্বাচনে আপনারা নারী বিরোধী অবস্থান গ্রহণের দায় কিবাবে তাহলে এড়াবেন ? এবং আপনাদের নারী বিরোধী অবস্থানের প্রমাণ দেবার জন্যে নারী সংগঠন লাগবে না আপনাদের দু'জনের দলের সদস্যরাই আপনাদের বিপক্ষে প্রমাণ হাজির করবেন। তার লক্ষণ আমরা এখনই দেখছি।

শেষে একটি কথা বলতে চাই। সংরক্ষিত আসনের প্রশ্নে নারী সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে ঐকমত্য আছে সেটা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন হতেই হবে। এখানে কোনো ভিন্নমত নাই। তবে এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ নির্ধারিত হবে না অনির্ধারিত হবে তা নিয়ে কারো কারো ভিন্ন মত আছে। সম্মিলিত নারীসমাজ এবং আরো অনেক সংগঠন মনে করে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে এবং আসন মেয়াদী হতে হবে। এবং ব্যবহারিক প্রশ্নে আসন সংখ্যা ৬৪ হবে নাকি ১০০ হবে নাকি ১৫০ হবে সব বিষয়ই এখন আলোচনার পর্যায়ে আছে। সম্প্রতি ব্যারিস্টার তানিয়া আমির একটি বিল সকল নারী সংগঠনের পক্ষে দিয়েছেন বলে যে কথাটি উঠেছে তাতে বিভ্রান্তি দৃষ্টি হয়েছে। কারণ এটা তানিয়ার নিজের এবং সম্ভবত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের বিল। তারা একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা অন্য নারী সংগঠনগুলো বিচার বিবেচনা করে দেখবে। কিন্তু এটা সকল নারী সংগঠনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। তবে আমরা সকল ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতি। মতামত ভিন্ন হলেই দুশ্চিন্তার কিছু নাই, বরং আমি মনে করি এটা ভালো লক্ষণ। সকলে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। এটাকে স্বাগত জানানো উচিত। আমাদের আরো একটি দাবী আছে যেটা আসলে স্থায়ী দাবী। সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যেনো সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেবার সময় কমপক্ষে ১০% (ক্রমে এটা বাড়াতে হবে ৩০% পর্যন্ত) মহিলা প্রার্থী দেন। হার-জিতের কথা এই মুহূর্তে ভাবলে চলবে না। মহিলারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাজে জড়িত হবেন এবং একসময় নিজের স্থান

নিজেই করে নিতে পারবেন। যারা উদ্বিগ্ন যে রাজনৈতিক দলগুলো সম্ভব্য হেরে যাবার আসনগুলোতেই মহিলাদের মনোনয়ন দেবেন তাতেও আমাদের আপত্তি নাই। আপাতত আমরা চাই এই নীতিগত প্রশ্নের মীমাংসা। সেটা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংগঠনের মহিলা রাজনীতিবিদদের বেলায় একটু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে রাজনৈতিক দল এবং নারী সংগঠনের নেত্রিরা সকলেই প্রস্তুত আছেন।

[আজকের কাগজ, ১৯ জুলাই, ২০০০]

সংরক্ষিত আসন নিয়ে কানাঘুষা ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসেছে, বিরোধীদল এবং নারী আসন শূন্য অবস্থায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটলো। বিরোধী দল, অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাত্র ৬৮টি আসন পেয়েছে, আর বিএনপি এবং জোটবদ্ধ দলগুলো সংসদে দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে দাপটের সাথে বসেছে। আমরা আশা করবো নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার কারণে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামতো সংসদ পরিচালনা করবেন না। জনগণ 'যা-ইচ্ছে তা করা' র জন্যে ভোট দেয় নি। সংসদ নেত্রী খালেদা জিয়া এই ব্যাপারে সতর্ক ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে আমরা খুশি। তবে আগামি পাঁচ বছর বড় দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে এই কথা মনে থাকবে কি না সেটাই ভাবনার বিষয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগকেও জনগণ রাস্তায় আন্দোলনের জন্যে ভোট দেয় নি, ভোট দিয়েছে জাতীয় সংসদে তাঁদের ভূমিকা পালন করতো। সেটা সরকার গঠনের ভূমিকা যেমন হতে পারে তেমনি বিরোধী দলেরও হতে পারে। দুটোই গুরুত্বপুর্ণ। সংসদে কাউকে না কাউকে বিরোধী হতে হবে। এবার আওয়ামী লীগ সেই ভূমিকা পেয়েছে। এটা সত্যি, আওয়ামী লীগের জন্যে এই ফলাফল প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তাই বলে প্রত্যাশার বিপরীত কিছু ঘটবে না এমন কথা তো কোথাও লেখা নাই। কাজেই জনগণকে হতাশ না করে আওয়ামী লীগ যেন সংসদে যায় এই আশা আমরা করছি। এই সময় আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিরোধী দল হিশেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসন বর্তমান সংসদে নাই। সংসদটি দেখতে বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকছে। সংবিধান অনুযায়ী নারীদের জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা সপ্তম সংসদে শেষ হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, এই আসনগুলোর প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায় নি। এই আসন ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই আসনগুলো নিয়ে জল্পনা কল্পনা ও কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে প্রচুর। এটাই স্বাভাবিক। কারণ সপ্তম সংসদের মেয়াদকালে এ বিষয়টি নিয়ে খুবই বড় ধরণের আন্দোলন হয়েছে। সম্মিলিত নারী সমাজসহ বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলো দাবী করেছে এই আসনের মেয়াদ বাড়ানো, আসন সংখ্যা বাড়ানো এবং সবচেয়ে বড়া কথা, সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্যে। এই আন্দোলন এখনও চলছে। এখন দেখছি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিশেবে বিএনপিতে সংরক্ষিত আসনের জন্যে মহিলা সাংসদ হবার জন্যে লবিং চলছে। এই তথ্য পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি, আশেপাশে শোনাও যাচ্ছে। এতে কেউ অবাক হচ্ছেন না কারণ প্রতিবারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মহিলা কর্মীরা দরের জন্যে যে পরিশ্রম করেন তার জন্যে বোনাস পাবার সুযোগ এটাই। কাজেই তাঁরা সেই বোনাস চাইবেন এতে আমরা অবাক হবো না। এখানে এসে তাঁরা সরাসরি নির্বাচনের বিপরীতে অবস্থান নিচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন এই আসনগুলো তাঁদেরই প্রাপ্য। এক্ষেত্রে তাঁরা নারীসংগঠনগুলোকে তাঁদের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছেন। আমরা এমন ভুল ধারণা ভাঙ্গাতে চাই। এই দাবী সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারীর অবমাননাকর অবস্থান পরিবর্তন করে আত্মমর্যাদা, যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দাবী। এখানে নারীদের মধ্যে পরস্পরকে ভুল বোঝার কোনই অবকাশ নাই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে নির্বাচনের আগে নারী আন্দোলনের দাবীর মুখে নারী ভোটারদের নাকের ডগায় 'সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন' দেবার একটা মূলা ঝুলিয়ে দিলো আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়ে। দুটি দলই প্রতিশ্রুতি দিলো সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং সরাসরি নির্বাচন দেয়া হবে। বাহ। নারী আন্দোলনের একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে সাধারণভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই তা ইতিবাচক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাঁরা আসন সংখ্যা বাড়ানোর কথা যতো বেশি বলেছে সরাসরি নির্বাচনের কথা ততো বেশি বলে নি। শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে শেষ পর্যন্ত যখন বলেছেন তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমরা বহুবার অধীর আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর

বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু তিনি সরাসরি নির্বাচন দেবার কথা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত বলেন, কিন্তু জাতীয় সংসদের প্রশ্নে বলেন না। তাছাড়া আওয়ামী লীগের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী যে বিল এনেছিলেন তাতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ছিল কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের কথা ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁকে বারে বারে বিলটি প্রত্যাহার করে সরাসরি নির্বাচনের বিল আনার কথা বলা হলেও তিনি কোন মতেই দাবীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা দেখান নি। এমনকি তৎকালীন ডেপুটি স্পিকারের কাছে সম্মিলিত নারী সমাজের প্রতিনিধি দল গেলে তিনি সোজা বলে দেন, 'আপনারা বললেই তো আর হবে না'। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে যথেষ্ট গোঁয়ারতুমি দেখিয়েছে। মনে হচ্ছিল তারা এতো বেশি নিশ্চিত ছিল যে তারা আবারো নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং সরকার নির্বাচন তাদের যেন দিতে না হয় সেই চেষ্টাই ছিল। তাহলে এই আসনগুলো তাদের হাতেই থাকবে। পরে অবশ্য তাঁরা মত পাল্টিয়ে সরাসরি নির্বাচনের কথা নির্বাচনী ইশতেহারে দিয়েছে। এটা খুবই ভাল কথা। তাৎকালীন বিরোধী দল হিশেবে বিএনপির লাগাতার অনুপস্থিতি সংরক্ষিত আসনের বিলের পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে দিয়েছিল, এতেও কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে বড় জনসভায় এবং টিভি ও বেতার ভাষণে সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে তাঁর সুস্পষ্ট উচ্চারণে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনেকের মনে আশার আলো জাগিয়েছে। আমরা এখনও সেই আশা নিয়ে আছি।

যাহোক, অষ্টম সংসদ বসেছে। নারী আন্দোলন আবারো লাগাতার কর্মসূচী করে আসছে, এটা মনে করিয়ে দিতে যে আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার সময় হয়ে গেছে। এমন সময় শোনা যাচ্ছে নানা ধরনের গুঞ্জন। তার কিছুটা পত্রিকায়ও আসছে। কারণ প্রচার মাধ্যমও যথেষ্ট আগ্রহভরে কান খাড়া করে রেখেছে কোথায় কে কী বলে। এর মধ্যে তিন ধরণের গুজব শোনা যাচ্ছে। আমি এই সব খবরকে গুজবই বলতে চাই কারণ এখনও সরকারের পক্ষ থেকে কোন অফিসিয়াল ঘোষণা পাই নি। এখন গুজবগুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক।

গুজব এক: সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়বে। নারী সংগঠনগুলোর দাবীর সাথে সঙ্গতি রেখে ৬০টি করার পরিকল্পনা কর হচ্ছে। এতে সংসদের মোট আসন সংখ্যা বেড়ে হবে ৩৬০টি। এই আসনগুলো এই অষ্টম সংসদে সরাসরি নির্বাচনে হবে না, নির্বাচিত সাংসদদের মনোনয় নাই হবে। অর্থাৎ

অষ্টম সংসদে সরাসরি নির্বাচন হবে না। শুধুমাত্র বিএনপি এবং জোটের শরিক দলের নারী প্রতিনিধিরা মনোনীত হয়ে আসবেন। শোনা যাচ্ছে ইতোমধ্যে বায়োডাটা নেয়া শুরু হয়ে গেছে, লবিং বা সহজ বাংলায় বললে জোর ধরাধরিও শুরু হয়ে গেছে। বিএনপির মহিলা কর্মীরা এতো সহজে পাওয়া সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন। তাঁরা সরাসরি নির্বাচন হলে জয়ী হয়ে আসার মতো যোগ্যতা এবং সুযোগ থাকলেও এখন মনোনীত হয়ে সাংসদ হলেই খুশি। দুঃখ হয় যে এতো পরিশ্রমী ও যোগ্য নারী রাজনৈতিক কর্মীরা সরাসরি জনগণের ভোটে না এসে সাধারণ আসনের সাংসদদের (যাদের অধিকাংশই পুরুষ) করুণা নিয়ে আসতে চাইছেন। বিএনপির দিক থেকে এটা করা হলে আমরা ধরে নেবো তাঁরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

গুজব দুই: বিএনপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও সংরক্ষিত আসনের সকল আসন নিজেরাই পুরণ করার পক্ষপাতী নয়। তাই সংসদে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের সাধারণ আসনের প্রতিনিধিদের আনুপাতিক হারে মনোনয়ন দানের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এই আনুপাতিক হারের বুদ্ধিটা বিএনপির নতুন ধারণা। কেউ নিশ্চয় এই বুদ্ধি দিয়েছে গণতান্ত্রিক হবার বোগাস চিন্তা থেকে। আমাদের কাছে এর অর্থ একটাই। সেটা হচ্ছে, সরাসরি নির্বাচন দিচ্ছে না, সকল দলের সাংসদরাই নারীদের মনোনীত করছেন। অর্থাৎ নারী আসনের যে বোনাসের সুযোগ মিলেছে তা বিএনপি একা নিতে চায় না। অন্যদেরও কিছু ভাগ দিতে চায়। আসন সংখ্যা যেহেতু বাড়ছে তাহলে কিছু আসন অন্যদের দিতে অসুবিধা নাই। এটা বিএনপির মহানুভবতা হিশেবে দেখবার কোনই অবকাশ আমাদের নাই। এই বিষয়ে বিরোধী দল হিশেবে আওয়ামী লীগ এমন বোনাস ভাগাভাগিতে যাবেন কিনা সে বিষয়ে কোন মতামত এখনও শোনা যায় নি। আমরা জানি না, তাঁরা বিষয়টিকে কিভাবে নিচ্ছেন। আওয়ামী লীগ এতে রাজি হলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে তাঁরাও সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাচ্ছেন। নারী সংগঠনের দিক থেকে আমাদের কথা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচনের দাবী যেখানে এতো জারালো ভাবে রয়েছে, সেখানে আনুপাতিক হারে মনোনয়ন দানের কথা বলা মানে ক্ষুধার পেটে মুরকি খাইয়ে ভোলানোর চেষ্টা করা। এটা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। যেখানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে এই দাবী তোলা হচ্ছে সেখানে এই ধরণের প্রস্তাব দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁরা কেউই বুঝতে চাচ্ছেন না সরাসরি

নির্বাচনের দাবীর অর্থ কি। নারীরা সংসদের সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার মর্ম ধরতে না পারার কথা নয়। আসলে বোনাস মনোবৃত্তির প্রভাবেই এমন চিন্তা করতে পারছেন না।

গুজব তিন: সরাসরি নির্বাচনের বিল আনা হবে, তবে সময় লাগবে। কারণ কেমন করে নির্বাচন হবে, এতো খরচ সরকার দেবে কি না, নির্বাচনের এলাকা নির্ধারণ কি করে হবে, পাঁচটি সাধারণ আসনের সাংসদের বিপরীতে সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা আসন কী কোন জটিলতা সৃষ্টি করবে কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি নান জটিল প্রশ্ন উঠছে। এই গুজব খুবই ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। এও শোনা যাচ্ছে যে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ সকলের পরামর্শ নিতে আগ্রহী। তবে বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সকলে এই বিষয়ে একমত নন। তাঁরা এখন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে 'কি করে হবে, কেমন করে সম্ভব' ইত্যাদি প্রশ্ন তুলছেন। এবং নারী সংগঠনগুলোকেই চাপ দিচ্ছেন সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে। যেন বা সমস্যাগুলোর সমাধান যদি নারী সংগঠনগুলো নিজেরা দিতে না পারে তাহলে তাদের কথা মানবার কোন দরকার নাই। কেউ ভাত কাপড়ের দাবী করলেই তাকে কৃষি পদ্ধতি এবং তাঁতে কাপড় কি করে বুনতে হয় তা বলে দিতে হয় না। যারা ভাত কাপড় দেবার দায়িত্ব নেবে তাদেরই সে কথা জানা থাকা দরকার। সাধারণ আসনে যে সব নিয়মাবলী হয় তা নির্ধারণ করার জন্যে যেমন নির্বাচন কমিশন আচে তেমনি সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে তাঁরাই কাজ করবেন। তবে নারী সংগঠনগুলো সব সময়ই প্রস্তুত হয়ে আছে এ বিষয়ে কাজ করার জন্যে।

আমরা ধরে নিয়েছিলাম নির্বাচনী ইশতেহারে কেউ প্রতিশ্রুতি দিলে তা বাস্তবায়িত হয়। এবং এবারের সংসদ এমনই যে সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকরেও তা বিএনপির পক্ষে করা সম্ভব। এই সময় বিএনপির কাছ থেকে অন্য কোন ধরণের আচরণ আমাদের কাছে কাম্য নয়। 'প্রতিশ্রুতি দিলেই রক্ষা করতে বাধ্য নন' এমন মনোভাব যদি থাকে তবে অন্য কথা। সেটার দায় দায়িত্ব বিএনপিকেই নিতে হবে। আমরা আশা করবো বিএনপি বিষয়টিকে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের প্রতি তাদের সার্বিক অঙ্গীকারের দৃষ্টিতে দেখবেন। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সহজ কাজ, নিজেদের মহিলা কর্মীদেরও খুশি করা যায়। কিন্তু নারী সমাজ কি আর তাদের বিশ্বাস করবে?

(প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর, ২০০১)

সংসদ থেকে সংরক্ষিত নারী আসন বিলুপ্ত হতে চলেছে

নতুন বছরে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। সপ্তম সংসদের এটা ২১তম অধিবেশ। আবারও সংসদ বিরোধী দলবিহীন হয়েই থাকবে। ক্ষতি নাই, আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সংসদে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে জানি, কিন্তু নারী সমাজ তাকিয়ে আছে সংরক্ষিত আসনের বিলটি কি হবে?সময় আর নাই। এ বছর অর্থাৎ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সংবিধানের ৬৫(৩) ধারায় সংসদে নারীদের জন্য যে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছিল, এখন সে সুবিধা টিকে থাকবে কিনা তা আমরা জানি না। সবাই জানেন, সংবিধানের এই ধারা বজায় রাখা বা না রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হলে কিংবা কোনও প্রকার পরিবর্তন আনতে হলে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট লাগবে। আওয়ামী লীগের হাতে তত সংখ্যক সাংসদ নাই। তাঁরা একা একা এতদিন অনেক বিল পাস করেছেন। ওতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়েনি, কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বিল তাঁরা সেভাবে পাস করতে পারবেন না। এটা একদিক দিয়ে ভাল এই কারণে যে এই বিলটি পাস হতে হলে সরকার এবং বিরোধী দল উভয়কেই লাগবে। তবুও গত বছর সরকার একটা বিল উত্থাপন করে ফেলেছে শুধুমাত্র আরও ১০ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য। নারী আন্দোলন সরাসরি নির্বাচনের যে দাবি করেছে এই বিলে কোনও কথা নাই। ফলে নারী আন্দোলন এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

নারী আন্দোলনের পক্ষে থেকে শুধু মেয়াদ বাড়াবার কথা তো একবারও বলা হয়নি, আমরা বলেছি সরাসরি নির্বাচনের কথা। সরকার এবং বিরোধী দল এ কথা যেন বুঝতেই চাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সংসদে সংরক্ষিত আসনের গার্জিয়ান আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি। তারা যা চায় তাই হবে। এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি, যারা বাই-রোটেশন সরকার এবং বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকবে বলে ধরে নিয়েছেন, তারা সংরক্ষিত আসনের কথা বললেই বোঝেন কেবল মেয়াদ বাড়ানো কিংবা বড় জোর আসন সংখ্যা বাড়ানো কথা। এর বেশি তারা বুঝতে চান না। কারণ এর বাইরে তাদের লাভ নাই মেয়াদ এবং আসন সংখ্যা বাড়ালে বোনাসের মেয়াদও বাড়ে এবং সংখ্যাও বাড়ে। এটা তাদের জন্য খুবই লাভজনক। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নারী আন্দোলনের পক্ষে তারা হান্ডেট পার্সেন্ট রয়েছেন। কিন্তু গোল বাধে সরাসরি নির্বচনের কথা বললে। এতে সরকার কিংবা বিরোধীদল দুটোরই দায়িত্ব এসে পড়ে এক সুনির্দিষ্টভাবে নারী

অধিকারের প্রশ্নে তাঁদের অঙ্গীকার ঘোষণার কথা এসে পড়ে; দুই সরাসরি ভোটে গেলে সংসদের এই আসনগুলো এককভাবে তাঁদের হাতে নাও থাকতে পারে। এতে স্বতন্ত্র প্রার্থী, নারী সংগঠনের প্রার্থী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের নারী প্রার্থীরা এসে যেতে পারেন। সেখানেই তাদের অসুবিধা। তাঁদের কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে দুটো পার্টির ক্ষমতায় আসার জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন করা অন্যদের সুযোগ দেয়া নয়। নারীদের জন্য তো নয়ই।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন যথেষ্ট পরিণত তাঁরা নারী অধিকারের প্রশ্নকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেয়ার পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে সুযোগ দেয়া হয়েছিল সেই পরিস্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি এক নয়। সেই সময় সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের বিধান হয়তো ঠিক ছিল, কিন্তু দ্রুত এই পদ্ধতি পবির্তন করার বিধান রাখা উচিত ছিল। আসন সংরক্ষণ রাখা এক কথা আর নির্বাচন পদ্ধতি আর এক কথা। আসন সংরক্ষণের মধ্যে নারীর প্রতি এক ধরনের বিশেষ সুবিধা প্রধান এবং পক্ষপাতিত্ব আছে বটে। কারণ ধরেই নেয়া হয়েছে ৩০০টি আসন মূলত পুরুষদের সেখানে মহিলাদের আসতে সংবিধানে কোনও বাধা নাই কিন্তু সমাজে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। সেই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তোলার লক্ষই ছিল সংরক্ষিত আসনের বিধান। কিন্তু মনে হচ্ছে সবাই মনে করছেন এটাই যেন নারীদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা পরিস্কার বলছি, সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাখার আন্দোলন একটি সাময়িক পদক্ষেপ মাত্র, এটাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ হচ্ছে ব্যক্তি হিসাবে সাধারণ আসনে প্রতিদন্দ্বিতা করে জনগণের নির্বাচিত সদস্য হওয়া। এর জন্য আমাদের একটি দাবী সব সময়ই করেছি তা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো ১০% মনোনয়ন নারী প্রতিনিধিদের দেবেন। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি মানে হচ্ছে অন্য নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা বাছাই হওয়া। একে নির্বাচন বলে না। জনগণের সঙ্গে কোনও সম্পৃক্তি থাকে না, জবাবদিহিতা থাকে না। এভাবে সংসদে বসে থাকার কোনও অর্থ নাই। এই কথা বুঝতে নারীদের সময় বেশি লাগেনি। আলোচনা আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে এই দাবী জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয় ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের ১৭ দফা দাবিতে আমরা তখনই দাবী তুললাম, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দেয়ার। এই দাবীর প্রতি ক্রমাগতভাবে সমর্থন বেড়েছে। নারী অধিকার এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন সবাই এই দাবীর প্রতি একমত পোষণ করছেন। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের দাবী যখন উঠেছিল তখন স্বৈরাচার বিরোধী

আন্দোল তুঙ্গে। সেই এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ঘটল, এরপর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে একবার বিএনপি পাঁচ বছর ক্ষমতায় কাটিয়ে গেল, এখন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার সময়কালও শেষ প্রয়, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন না যে সরাসরি নির্বাচনই এখন সংরক্ষিত আসন রাখার একমাত্র যুক্তি হতে পারে। নইলে নয়। নারীর ক্ষমতায়নের বলি আওড়ে সংরক্ষিত আসনের কথা বলবেন আর নিজেরা বোনাসের সুবিধা ভোগ করবেন সেটা তো হয় না। বর্তমানে বিভিন্ন নারী সংগঠন এই একটি বিষয়ে একমত হয়েছে যে সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচন দিতে হবে। সম্মিলিত নারী সমাজ এ ব্যাপারে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। নারী সংগঠনগুলোর বিভিন্ন ফোরাম গঠিত হয়েছে। কিন্তু সরকার এবং বিরোধী দল যেন তাঁদের অবস্থানে অনড় হয়ে আছেন। কোনও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও বোনাসের প্রশ্নে এত অনড় অবস্থা নিয়েছেন কিনা আমার জানা নাই। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ 'স্বার্থ' রক্ষার এহেন ন্যাক্কারজনক কাজ ইতিহাসে কি রংয়ের কালিতে লেখা হবে তা নিয়ে ভাবছি, কারণ কালো রংও এই বিচ্ছিরি বর্ণনার জন্য যথেষ্ট নয়।

এখন বিরোধী দল বিএনপি পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা সংরক্ষিত আসনের বিলের জন্যও সংসদে আসবেন না। ইংরেজি দৈনিক ডেইলী স্টারের এক বিশেষ প্রতিবেদনে (১১ জানুয়ারি, ২০০১) বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া স্পিকারে দেয়া চিঠির উত্তরে তাঁর সর্বশেষ ফর্মূলা দিয়েছেন যে তার চেয়ে আওয়ামী লীগ পদত্যাগ করে এপ্রিলের আগেই নির্বাচন দিয়ে দিক, তাহলে নতুন সরকার এসে (কথায় মনে হচ্ছে বিএনপি সম্ভবত ভাবছে ৮ম সংসদে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন) তাহলে তাঁরাই সংসদে সংরক্ষিত আসনের বিল পাস করবেন। অর্থাৎ বিএনপির সাফ কথা সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগ বিল উত্থাপন করলে তাঁরা সমর্থন দেবেন না। ফলে সরকারি দল, আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়াবার জন্য বিল আনলেও তা বাতিল হয়ে যাবে, কারণ এ বিল পাস হতে হলে সংসদের যে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। বিএনপি মহাসচিব আরও এক ডিগ্রি ওপরে উঠে প্রস্তাব দিয়েছেন যে, অষ্টম সংসদে তাঁরা নতুন করে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের চেষ্টা করবেন) বেশ, নারী সংগঠনগুলো এখন তীর্থের কাকের মতো চেয়ে থাকবে কখন বিএনপি নতুন করে সংসদে নারীদের জন্য নতুন করে বিল আনবেন? আমাদের কি সেই দয়া দাক্ষিণের দরকার আছে?

এদিকে সরকারের জন্য একটা মহাসুযোগ। সংসদীয় কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত খুবই বিজ্ঞর মতো বিএনপির এই আচরণের সমালোচনা করে বলেছেন, ভোটারদের অর্ধেক (অর্থাৎ নারী ভোটার) বিএনপিকে ভোট দেবে না, কারণ তাদের কারণে এই আসনগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে মনে হচ্ছে সুরঞ্জিত বাবু একটু খুশি হয়েছেন কারণ এই অর্ধেক ভোটার তাহলে আওয়ামী লীগকে ভোট না দিয়ে আর কোথায় ভোট দেবে? এতে আওয়ামী লীগের আবারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অতএব, বিএনপি সংসদে যোগদান না করায় সংরক্ষিত আসনের বিলুপ্তি ঘটলে আওয়অমী লীগ নির্বাচনী প্রচারণায় ক্রমাগতভাবে বিএনপির বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনা করে মহিলাদেরকে বোঝাবে যে একমাত্র বিএনপির কারণেই এই আসনগুলোর এমন দশা হল। কি সাংঘাতিক দল তারা। নারীদের কোনভাবেই বিএনপিকে ভোট দেয়া উচিত হবে না। তাই বিএনপিকে বলছি, আপনারা নারী অধিকার না বুঝুন ক্ষতি নাই, এমনকি নির্বাচনের আগে এটাও বোঝেন না, আপনাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য নিজেই আওয়ামী লীগের হাতে আর একটি অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন। তবে আওয়ামী লীগ এই ফাঁকে নিজেকে কি আসলে রক্ষা করতে পারবে? আমরা খুব ভাল করে জানি সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিলে সরসরি নির্বাচনের কথা নাই, আছে শুধু মেয়াদ বৃদ্ধির কথা। সব নারী সংগঠনই এই প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। কিন্তু বিলটি এখনও প্রত্যহার করা হয়নি। তারা খুঁটিনাটি বিষয় নাকি ষ্টাডিং কমিটিতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করতে, কিন্তু আসলেই নারীদের দাবীকে বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা তার কোনই গ্যারান্টি নাই। বড় জোর আসন সংখ্যা বাড়তে পারেন। তাতে আমাদের কোনই লাভ নাই, লাভ তাদেরই।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির এই আচরণ নারী সমাজতে ক্রমাগতভাবে ক্ষব্ধ করছে। জনগণও এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন তাঁদের প্রতি। আমি দেখেছি, সরসরি নির্বাচনের বিষয়ে সাধারণভাবে জনসমর্থন আছে অথচ এই দুটি দল জনগণের মনের একটিও বুঝতে পারেন না।

শেষ ফল বুঝি এই হবে যে আগামী এপ্রিল মাসে সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হবে এবং সেই সঙ্গে এই আসনগুলোর বিলুপ্তি ঘটবে। এর দায় দায়িত্ব কে নেবন, জানতে চাই।

(১৬ জানুয়ারী, ২০০১ যুগান্তর)

প্রসঙ্গ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন: এবার একটি সমাধান আসা যাক

আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ গত ২০ জুলাই তারিখে একটি খুশির খবর ঘোষণা করেছেন। সেটা হচ্ছে, এই সংসদেই জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বচনের বিল উত্থাপন করা হবে। এটা আমাদের জন্যে খুশির খবর। কারণ অন্তত তাঁর মুখ থেকে 'সরসরি কথাটি উচ্চারিত হয়ে গেছে। বাব্বাহ। এই জোট সরকার সংসদে দুই-তৃতীয়ংশ আসন নিয়ে বসে আছে ২০০১ সালের জুলাই মাস থেকে। নির্বাচনী ইশতেহারে সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচনের অঙ্গীকার করার পর এতো দিন পার হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত কোন বিল উত্থাপিত হয় নি বলে আমাদেও মনে অনেক ক্ষোভ জমে আছে। এই ক্ষোভের মধ্যে মন যখন বেজার তখন ব্যারিষ্টার মওদুদের এই কথাটি শুনতে ভাল লেগেছে আমাদের অনেকেরই। আমি অবশ্য সরাসরি শুনি নি, পত্রিকায় পড়েছি।

ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের যৌথ আয়োজনে 'নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: বর্তমান প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যত করণীয়' শীষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনেক নারী নেত্রীরা উপস্থিতি হয়েছিলেন, বিদেশ থেকেও অনেকে এসেছিলেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে অভিযোগ করে বলেছেন যে আগে তাঁদের অনুপস্থিতির কারণে আওয়ামী লীগ বিল আনতে পারে নি, আর এখন তাঁদের হাতে দুই-তৃতীয়াংশ আসন থাকার পরও তাঁরা বিল আনছেন না। বিরোধী দল হিশাবে এই অভিযোগ তিনি করতেই পারেন। সেখানে দুএকজন সাংসদ (পুরুষ অবশ্যই) যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলছেন, সংরক্ষিত আসন এবং সরাসরি নির্বাচন এই দুটি পরস্পর বিরোধী। এই নিয়ে নাকি নারী সংগঠনগুলোকে আরও ভাবতে হবে। কি জ্বালা। এতোদিন আমরা তাহলে কি করলাম। ব্যারিষ্টার মওদুদ বলছেন, সংরক্ষিত আসন নিয়ে জাতীয় ঐক্যমত থাকলেও এর পদ্ধতি নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নাই। কথাটি কি ঠিক?

কোন একটি সেমিনারে বক্তৃতাকালে এই ধরণের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে হলে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ তথ্য সামনে রেখে বলা উচিত। নারী আন্দোলনের দাবীগুলোকে ভাল করে পর্যালোচনা না করার কারণেই

অনেক মন্তব্য ঝটপট করে ফেলা হয়। যেমন, একটি মন্তব্য, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন-এটা স্ববিরোধী দাবী। খুব সত্যি কথা। কিন্তু যিনি এ কথা বলেছেন মনে হচ্ছে তিনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠেছেন। তিনি জানেন না যে নারী আন্দোলনের দাবীর মধ্যে বিষয়টিকে কিভাবে সমাধান করা হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের যে দাবী উঠছে তা কি এতোদিন কেউ না ভেবেই বলেছেন? আমরা কি শুধু শুধুই দাবীগুলো করছি? কেউ স্ববিরোধিতাও বুঝি না? মহা যন্ত্রণার কথা! এমন ধারণা কেন সৃষ্টি করা হয়? এভাবে কথা বলা নেহায়েত পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞানের স্বভাব থেকে আসে। কেউ যদি নারী আন্দোলনের দাবীগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন যে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষণের দাবীটি আমাদের একেবারে সাময়িক দাবী। দীর্ঘস্থায়ী নয়। আমরা চেয়েছি আর মাত্র দুটি টার্ম (১০ বছর) আসন সংরক্ষিত থাকবে। এবং তা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হলে নারীরা ইতিমধ্যে তাঁদের নিজ নির্বাচনী এলাকা ঠিক করে ভবিষ্যতে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুনেও শোনে না তা হচ্ছে, সাধারণ আসনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল থেকে ১০ শতাংশ আসনে নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে। সেদিনের সেমিনারে সম্মিলিত নারী সমাজের নেত্রী শিরীন আখতার কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়েছেন। পত্রিকায় একটি লাইন সেটাও এসেছে। সে বিষয়ে কিন্তু কথা কেউ বলে না। তখন তো বোঝা উচিত যে নারী সমাজ এ বিষয়টি সমাধানের পথ বলেই দিচ্ছে কই তখন তো কাউকে মাথা নাড়তে (সম্মতিসূচক) দেখি না।

যদি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তো ল্যাঠা একবারেই চুকে গোলো। কিন্তু প্রতিবার নির্বাচনের সময়ই দেখি বড় দল হোক বা ছোট, এমনকি বাম দলগুলোসহ সবাই মিলে এক আচরণ। আসলে পুরুষতন্ত্র ভিন্ন হবেই বা কি করে? না, না, মহিলাদের মনোনয়ন দিয়ে হারবো নাকি? সংসদে আমাদের আসন পেতেই হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে পুরুষ সাংসদ লাগবেই। তা স্মাগলার হোক, কি সন্ত্রাসী হোক কিছুই এসে যায় না। তাদের মনোনয়ন দিতে হবে। সবচেয়ে মজার কথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তখনও পুরুষ রাজনৈতিক নেতারা বলেন, 'আপনারা পারবেন না। কারণ আপনাদের টাকা (মানে কালো টাকা) নাই, আপনাদের সন্ত্রাসী ক্ষমতা নাই ইত্যাদি। নির্বাচন করা খুবই কঠিন জিনিস।' তাইতো, আমরা বুঝি এ কথা জানি না।

আমরা বলেছি নির্বাচন পদ্ধতিই বদলাতে হবে। সেটা সাধারণ আসনের জন্যেও বদলাতে হবে। এখন যেভাবে নির্বাচন হয় তাতে সৎ, নীতিবান পুরুষদেরও নারীদের মতো ভেবে বলা হয়, আপনি আর যাই করেন, নির্বাচন করতে পারবেন না। সংসদে তাই সৎ, নীতিবান সাংসদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র আছেন। তাঁরা নিজেদের এলাকায় জনপ্রিয়তার কারণে উঠে আসতে পেরেছেন। কিন্তু তাদেরও মনোনয়ন পেতে হিমসিম খেতে হয়। তাই জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটির সাথে পুরো নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক আছে। নারীদের বর্তমান সন্ত্রাস ও কালো টাকা নির্ভর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ কিংবা না করার জন্যে ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। বরং নির্বাচন পদ্ধতি বদলাবার চেষ্টা করুন।

সে যাই হোক, আমরা বারে বারে পুরনো কথা বলে কিংবা প্যাঁচালো কথা বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে চাই না। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারীর সরাসরি নির্বাচনের দাবী মেনে নিয়ে বর্তমান আইন মন্ত্রী যদি একটি বিল উত্থাপন করেন তাহলে দেশ ও জাতির জন্যে একটি ভাল কাজ করা হবে। প্রথম কথা হচ্ছে সরাসরি নির্বাচনের বিল উত্থাপন করতেই হবে। এর জন্যে অন্যের ডাকা সেমিনারে নয় সরকারকে নিজেই সকল নারী সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে মতবিনিময়ের জন্য। আইনমন্ত্রী বলছেন, এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নারী সংগঠনগুলো তাঁকে দেন নি। কথাটি তিনি ঠিক বলেন নি। কারণ এ সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই সম্মিলিত নারী সমাজে একটি দল তাঁর সাথে দেখা করে বলে এসেছে যে আসুন আমরা সবাই বসে ঠিক করি নির্বাচনী এলাকা কি হবে। আসন সংখ্যা নিয়েও যে ভিন্ন প্রস্তাব আছে, সেটার ব্যাপারেও কেউ গোঁয়ার্তুমি করবে না। আরো অনেক সংগঠন তাঁকে বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। আজ আইন মন্ত্রণালয় কোন সভা ডাকে নি। আসন সংখ্যা ৬৪ হবে কি ৬০ হবে নাকি ১০০ হবে তা ঠিক করা খুব বড় ধরণের সমস্যা নয়। যদি বলেনে সংসদে চেয়ার বেশী নাই, তাই সই। তবুও দয়া করে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু করে দিন। এই হোল আমাদের মূল কথা আমার মনে হয় না, নারী সংগঠন এ নিয়ে খুব বড় বিতর্ক করবে।

নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে তা নিয়ে শুধু নারী সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হবে? এটা তো নির্বাচন কমিশনের বিষয়। একবার কি কেউ বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে? একুশটি মাস পার হয়ে গেলো। সরকার কিছুই করলেন না। যতোবার বলা হয় ততোবারই 'সম্ভব নয় সম্ভব নয়' এমন একটি ভাব

দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এতো দিনে সরাসরি নির্বাচনের পদ্ধতি কি হবে এ ব্যাপারে ডক্টরেট থিসিস করা যেতো। দেখুন তো সংসদের দিতে তাকিয়ে, দেখতে কেমন বাজে লাগে? এই সংসদ শতকরা ৫০% ভাগ মানুষের বিপক্ষের একটি সংসদ হয়ে আছে।

কিছুদিন আগে নারী নির্যাতন দমন বিলটিও কারো সাথে পরামর্শ না করে সংসদে পাশ করা হয়ে গেছে। যখন বলা হোল যে কেন কারো সাথে পরামর্শ করা হয়নি, তখন বলা হোল অবশ্যই করা হয়েছে। তাঁরা যে সভা করেছেন সেখানে নাকি রুম ভরা মহিলা ছিলেন। অথচ নারী সংগঠনগুলো চোখ বড় বড় করে বললেন, হায়রে আমরা তো কিছুই জানলাম না। বুঝতে পারছি না বাংলাদেশ এতো ছোট দেশ হওয়া সত্তেও এতো গ্যাপ হয় কি করে? কোন একটি বিল পাশ হবার পর প্রতিবাদ মিছিল করার আগেই একটু অনুরোধ করছি, যদি একটু কষ্ট করে সরকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ করে নেন তাহলে কি ভাল হয় না?

শেষ কথা হচ্ছে, আইনমন্ত্রী একটি কথা পরিস্কার বলে ফেলছেন, সরাসরি নির্বাচনের দাবী মানলেও অষ্টম সংসদে নির্বাচন হবে না। প্র্যাক্টিক্যাল কথা, বাস্তব সত্য। যে বিলটি আসবে তা কার্যকরী হবে নবম সংসদে। কিন্তু এই সংসদ তো আরও তিন বছর থাকবে। তাহলে কি তিন বছর এখানে কোন নারী সাংসদ থাকবে না? সেটাই বা কেমন করে হয়?

প্রথমত: আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে যদি বিলটি আনা হয় তাতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলেই শুধু জোট সরকারের ভোটেই যেন বিলটি পাশ না হয়। সরাসরি নির্বাচনের বিলে অবশ্যই বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ যেন থাকে তার জন্যে সরকারকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: নবম সংসদে সরাসরি নির্বাচন দেয়া হলেও এই সংসদে সংরক্ষিত আসন কিভাবে পুরণ করা হবে তার জন্য নারী সংগঠনের মতামত সহ সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নবম সংসদে সরসরি নির্বাচন দেয়ার কথা বলে এক্ষুনি জোট সরকারের মনোনীত মহিলাদের বসিয়ে দিলে হবে না। এর জন্য একটি অন্তবর্তীকালীন নীতি আমরা সকলে মিলে অবশ্যই ভাবতে পারি।

তৃতীয়ত: সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের আগামি নির্বাচনে সাধারণ আসনে শতকরা ১০ ভাগ মনোনয়ন নারীদের দেয়ার বিধান এখন থেকে চালু করতে হবে। বিলে এই কথাও অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে সংরক্ষিত আসন ভবিষ্যতে কি করে বিলুপ্ত হবে তারই পথ।

আসলে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গার্মেন্টে যেমন কোটা সুবিধা পেতে পেতে আমাদের গার্মেন্ট মালিকদের একটি দুটি দেশের বাজারের ওপর নির্ভরশীলতার বদ অভ্যাশ হয়ে গেছে তেমনি সংরক্ষিত আসনের মনোনয়ন পদ্ধতির ব্যবস্থা বারে বারে নবায়ন করে রাজনৈতিক দলগুলোর এক ধরণের নির্ভরশীলতা এসে গেছে যা দূর করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। গার্মেন্টের ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা শ্রমিকের চেয়ে মালিকের যেমন সুবিধা বেশী করে দেয় তেমনি সংরক্ষিত আসনে মনোনয়নের ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে বোনাস সুবিধা দেয়, নারীদের দেয় না। আগামি ২০০৫ সালের ১ লা জানুয়ারি গার্মেন্ট কোটা ব্যবস্থা উঠে যাচ্ছে। এতে গেলো, গেলো রব উঠেছে, শ্রমিকের কথা বলে গার্মেন্ট মালিকরা খুব কাঁন্না করছেন। অথচ তাঁরা শ্রমিকের সুবিধা এক ফোটাও বাড়াতে রাজী নন। সংরক্ষিত আসনের গত সংসদে শেষ হবার সময় আমরা অনেক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম, আসন রাখতে হলে নির্বাচন পদ্ধতি বদল করুন। কেউ শোনে নি। কারণ তাদের কোটা সুবিধা থাকছিল না। এখন ভালই হয়েছে। আমরা নতুন করে ভাবতে পারছি। আমাদের সময়ের সদব্যবহার করতে হবে। সময়ের মূল্য বুঝে কাজ করাই আমাদের দরকার নারীদের ন্যায্য দাবীকে সম্মান করুন।

সংসদের ফুটবল ময়দানে আইনমন্ত্রীর কালো গোল

দেশে প্রথম মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে হলো। এই ফুটবল খেলা নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠি বহু চেষ্টা করেছে খেলা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে (এবার সে রহমত বৃষ্টি আকারেই বর্ষিত হয়েছে), মেয়েদের গোল করা এবং বিজয় লাভ থেকে বিরত করা যায় নি। তারা আনসারকে ১-০ গোল দিয়ে শিরোপা জয় করেছেন, মেয়েদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সাবাশ। মেয়েদের খেলায় বাধা দেয়ার মানসিকতা বেশ নিম্নমানের রুচির পরিচয়। এ নিয়ে কথা বলাও বিচ্ছিরি ব্যাপার। ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্কই নাই। প্রশ্ন করি, মেয়েদের খেলা কি এখন থেকে হচ্ছে? বেগম রোকেয়া যখন মুসলমান মেয়েদের নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়েল স্কুল করেন কখনও খেলাধূলার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কারণ খেলাধূলা আসলেই দরকার। বরং এখনকার স্কুলগুলোতে মেয়েদের খেলাধূলা কমই হয় বলে আমার মনে হয়। তাই ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। অন্তত যতো এগিয়ে থাকার কথা ছিল ততো হয় নি। এখন খেলার আয়োজনের পর আমাদের খুশি হবারই কথা, সেখানে নারী সংগঠনগুলোকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে প্রতিবাদ করতেই। বড্ড জ্বালার কথা। তবে ধন্যবাদ জানই দর্শকদের। তাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন বলেই মেয়েরা খেলতে পেরেছে। সাথে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীরও ইতিবাচক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এ কথা ইতিমধ্যে পত্রপত্রিকায় অনেকেই লিখেছেন যে অন্যান্য মুসলিম দেশেও মেয়েরা ফুটবল খেলেন। যারা মেয়েদের খেলার বিরোধিতা করছিলেন তারা কি সামান্য হোম ওয়ার্কটুকুও করেন না, নাকি যা মনে আসে ধর্মের নামে বলে দিলেই হোল? তাঁরা কি মনে করেছেন এদেশের মানুষ মূর্খ, কিছুই জানেন না? আরব দেশের মেয়েরাই যেখানে ফুটবল খেলেছে বলেছে তথ্য আছে সেখানে বাংলাদেশের মেয়েদের খেলতে বাধা দেয়া চরম মূর্খতা। যাক, আমাদের দেশের মানুষ এই ব্যাপারে নিজেদের প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা এসব ধর্মের অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হন নি।

ফুটবল খেলা শুধু স্টেডিয়ামে হয় না, আমাদের সংসদেও হয়। পায়ে বল না থাকতে পারে কিন্তু গোল দেয়ার ব্যাপার সব সময়ই থাকে। এখানে কিছু খেলোয়ার আছেন যারা সত্যিকারের স্টেডিয়ামকে ভয় পান। কারণ সেখানে সত্যি সত্যি পায়ে বল ঠেকিয়ে গোলের দিকে ছুঁড়তে হবে এবং সকল নিয়ম মেনে তা গোলের নেটে প্রবেশ করাতে হবে এবং রেফারী গোল হয়েছে বলে ঘোষণা দিলেই সেটা গোল হয়েছে বলে স্বীকৃত হবে। সাথে দর্শকরা উল্লসিত হবে। অর্থাৎ খেলার মাঠে গোল দিতে হলে রেফারীর মতামত যেমন লাগে তেমনি দর্শকের উল্লাসও গুরুত্বপূর্ণ। ফুটবল খেলা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া আমার কাজ নয়, এখন মেয়েরা যেহেতু ফুটবল খেলায় নেমেছে তখন একটু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। এতে আমাদেরও কিছুটা জ্ঞান বাড়তে পারে। রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি নিজেদের জীবন সবই তো খেলার সূত্রেই চলে। তাই মেয়েদের ফুটবল খেলার পর পরই যখন দেখলাম নারী আসনের বিল স্থায়ী কমিটিতে চুড়ান্ত করা হয়েছে তখন মনে হোল খেলা তো স্টেডিয়াম থেকে সরে গিয়ে এখন সংসদে ঢুকেছে। স্থায়ী কমিটিতে দুদিন নাকি বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। যদি সত্যিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করা হবে তাহলে চূড়ান্ত হয় কি করে? এতো ত্রুটিপূর্ণ এই বিরটি

চূড়ান্ত হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? তাছাড়া স্থায়ী কমিটিতেই আওয়ামী লীগ আপত্তি জানিয়েছে। তাহলে?

বোঝাই যাচ্ছে সংসদের এই খেলোয়ার এখানে এতো নিয়ম মানেন না। তিনি যা মনে আসে তাই করেন। রেফারী যদি সত্যিকারের কাজ করতেন তাহলে তাকে হয়তো হলুদ এমনকি লাল কার্ড দেখাতে হোত। প্রতিপক্ষ দল এখানে অংশগ্রহণ করছে না তাও তিনি খেলবেন! এই খেলায় দুই-তৃতীয়াংশ মাঠের মালিক তারা হয়েছেন, তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য? তাই জাতীয় সংসদের মাঠে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের খেলা তিনি খেলবেনই খেলবেন। বার বার বলা হচ্ছে এই খেলা নিয়ম বহিভূর্ত। এই খেলার রিহার্সেলেই গলদ দেখা দিয়েছে। হিশাবে গলদ আছে। কিন্তু এই খেলা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত মাঠে খেলে দুই-তৃতীয়াংশ গায়ের জোর দিয়ে বলটিকে জোর করে নেটের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে। কিন্তু দর্শকরা উল্লাস প্রকাশ করবেন না। তারা মূল চাওয়া পাওয়া করবে। তারা বিরক্ত হবে। রেফারী কি করবেন? এখানে অবশ্য আমি কিছু বলতে পারছি না।

অষ্টম জাতীয় সংসদ প্রায় তিন বছর পার করে দিল। সংরক্ষিত আসন বিলটিতে শুধু একটি বিধানের জন্যে এতো কান্ড হচ্ছে। আমাদের দাবী হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন দিন। আসন সংখ্যা বাড়ান। বেশি কিছু তো চাই নি। আপনারা যাদের সংসদের আসনে বসাতে চান তাঁরা অবশ্যই সরাসরি নির্বাচন করলেও আসতে পারেন। সেটা তাঁদের জন্যেও ভাল হবে। এতোদিন এতো দেন-দরবারের পর বিল আনা হোল আসন সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়ে কিন্তু সরাসরি নির্বাচন দিয়ে নয়, ভাগ-বাটোয়ারা করার প্রস্তাব দিয়ে। এই ভাগ-বাটোয়ারার বড় ভাগটি যে দল পাবে তাঁরাও এখন এই বিলের বিরোধিতা করছেন। তাহরে বিলটি পাশ হলেও বিএনপি, জাতীয় পাটি এবং জামায়াত ছাড়া বাকী আসনগুলো খালিই থাকবে। তাহলে বিলটির আর কিইবা গুরুত্ব থাকলো? কিন্তু আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কারো কথা শুনবেন না। তিনি এবার একটি গোল দেবেন। এই গোলটি তাঁর রাজনৈতিক খেলার জীবনে শেষ গোল কি না কে জানে? অন্তত ইতিহাসে তার গোলটির রং কালো হবে এইটুকু বলা যায়।

এবার আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি এই বিলটি উত্থাপন না করানোর জন্যে তিনি যেন বিশেষ উদ্যোগ নেন। জাতীয় সংসদের নারীদের আসন নিয়ে এই পর্যন্ত যতো মিছিল সমাবেশ, মানব বন্ধন হয়েছে

আর কোন বিষয় নিয়ে হয় নি। কাজেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার অনুরোধ করছি। বিএনপি এবং জোট সরকারের আমলের মাঝামাঝি সময়ে এই অন্যায় ঘটনাটি না ঘটালেই ভাল হবে। দেশের এতোগুলো নারী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এমনকি খোদ বিএনপির মধ্যে অনেকে আছেন যারা মনে করেন সরাসরি নির্বাচন দেয়াটাই যুক্তিপূর্ণ হবে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ যদি একমত না হয় তাহলে কি এটা করা ঠিক হবে?

আর সবশেষে বলছি আইভি রহমান এই বিশেষ দাবীর জন্যে নিজের দলের মধ্যেও সংগ্রাম করেছেন। আজ অন্তত এই মানুষটির কথা ভেবেও আইনমন্ত্রী এই বিলটি উত্থাপন থেকে বিরত থাকতে পারেন।

আর তা না হলে সংসদের রেফারী নয় দর্শকের সারি থেকে মাননীয় আইনমন্ত্রীকে আমরা লাল কার্ড দেখাবো। সত্যিকারের ফুটবল খেলায় মেয়েরা বাধা অতিক্রম করে জয়ী হয়েছে। এখন আইনমন্ত্রীর 'ভুল গোল' অতিক্রম করার পালা।

সংরক্ষিত আসন বিল পাস নাকি জোট সরকারের বিদায় ঘন্টা?

জাতীয় সংসদের মতো উচ্চতর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে মহিলাদের চরম অবমাননার ইতিহাস রচনা করলেন আমাদের অত্যন্ত দক্ষ আইনমন্ত্রী। তিনি মনে হয় শপথ নিয়েছেন বিএনপিকে জনগণের কাছে অপ্রিয় করে তুলবেনই, তাঁর সেই মহৎ কাজটি করেই চলেছেন। অতএব, এই বিলটি পাসের মাধ্যমে কি বিএনপি ও তার জোট সরকার তাদের বিদায় ঘন্টা বাজালেন? অবশ্য আমরা কেউই অবাক হই নি। কারণ যেভাবে এই জোট সরকার একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন সেখানে তাঁদের কাছে নারীরা কী ই বা আশা করতে পারে! না, আমরা কোন আশায় ছিলাম না যে মওদুদ সাহেব জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিলটি নিয়ে ভিন্নভাবে ভাববেন। তিনি সরাসরি নির্বাচনের বিলটি আনবেন না এটা আমরা জানতাম, তিনি নিজেও বলেছেন বারে বারে। অতএব, ঘটনা যা ঘটবার তাই ঘটেছে। 'জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন বিল ২০০৪ পাস হয়েছে ২৯ নভেম্বর ২০০৪ সালে। দিনটি ছিল সোমবার। এই বিলে বলা হয়েছে, সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ

নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ও জোটের আসন সংখ্যানুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকুলে সংরক্ষিত মহিলা আসন বন্টন করা হবে।'

এই বিলটি পাসের সময় সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতিতেই আইনমন্ত্রী বিলটি সংসদে এনেছেন। তারই দুদিন পরে বাউফলে বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, 'বিএনপি তাঁর নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষা করে"। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে তাঁর ওয়াদার তাহলে কি হোল? আহারে, এমন স্ববিরোধী কথা শুনলেই কানের মধ্যে কেমন যেন লাগে।

এই বিলটি জাতীয় সংসদে যখন পাস হয় তখন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বিলটিকে অসাংবিধানিক এবং নারীদের জন্যে অসম্মানজনক বলে অভিহিত করে ওয়াক আউট করেছে। স্থায়ী কমিটিতেই তারা নোট অব ডিসেন্ট দেন। তার অর্থ হচ্ছে আওয়ামী লীগ এই বিলটি পাসের কোন দায়িত্ব নেয় নি। এটা তাঁরা বুদ্ধিমানে কাজ করেছেন। ইতিহাসে বাজে কাজের অংশীদার যতো কম হওয়া যায় ততোই ভাল। মহিলা আওয়ামী লীগও বিলটির বিরোধিতা করেছে এবং তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেছে। আইভি (রহমান) আপা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় আরো বেশি প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু এটা অবশ্য নিশ্চিত বলা যাচ্চে না যে ভাগ-বাটোয়ারার এই বিলে আওয়ামী লীগের ভাগে যে ৯টি আসন পড়েছে তাতে তারা মনোনয়ন দেবেন কিনা। আওয়ামী শীর্ষ নেতাদের মধ্যে এ বিষয়ে দুই মত আছে। পক্ষের দল বলছে বিরোধিতা করলেই যে আসন নেয়া যাবে না তা নয়। কারণ এটা আইন হয়ে গেছে। আইন পাসের আগে বিরোধিতা করা আর আইন পাস হলে মেনে চলা এক কথা নয়। ফলে আওয়ামী লীগ নিতেও পারে। অন্যদিকে একটি পক্ষ বিলটির বিরোধিতা করেছে এবং আওয়ামী লীগের একজন সাংসদসহ কয়েকজন হাইকোর্টে বিলটির বিরুদ্ধে রিট মামলাও করেছেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দেশে নাই। দলের নেতারা বলছেন সভানেত্রী দেশে ফেরার পর দলীয় সিদ্ধান্ত জানানো হবে। দেখা যাক, কি হয়। আমাদের কাজ এখন এদের সবার কান্ডকারখানা দেখা।

যা হোক, পাস হওয়া এই বিলে নির্বাচন কমিশনকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে আসন বন্টনের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। চলতি সংসদের জন্যে অর্থাৎ আর মাত্র দু' বছরের জন্যে এই নারী

সাংসদরা মনোনীত হবেন। এখন থেকে একটি দিন দেরি মানে তাঁদের সুযোগ সুবিধা থেকে একটি দিন মাইনাস! যথা সময়ে গেজেট ও নির্বাচনী তফসীল ঘোষিত হলে আনুপাতিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ৪৫টি আসনে যারা আসন বন্টনের অধিকার হবেন তাঁরা হলেন, বিএনপি (২৯), আওয়ামী লীগ (৯), জামাত (৩), জাতীয় পার্টি (২), স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলো (২)। এই ক্ষুদ্র ও স্বতন্ত্র সাংসদদের ক্ষেত্রে মওদুদ সাহেবের একটি ভগ্নাংশের সমাধান আছে। সেটা হচ্ছে, বন্টন পদ্ধতি অনুযায়ী ভগ্নাংশ থেকে গেলে ওই দল বা জোটের অনুকুলে আসন বরাদ্দ হবে। প্রতি ৬ দশমিক ৬ জন সাধারণ আসনের বিপরীতে একটি সংরক্ষিত আসন হবে। এখন দেখা যাক, স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র দল হিসেবে কারা আছেন। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে চারদলীয় জোটের দুই শরীক বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির আসন রয়েছে ৪টি, ইসলামী ঐক্যজোটের ৩টি, কাদের সিদ্দিকীর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ১টি, আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর জাতীয় পার্টির ১টি ও বিকল্প ধারার ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩ জন। মোট এই ১৩টি আসনের বিপরীতে সংরক্ষিত আসনের ভাগ জুটবে ২টি আসন। কাদের সিদ্দিকী বিলটির বিরোধিতা করেছেন বলেই জানি। কাজেই তিনি মনোনয়ন দেবেন না মনে হয়। মওদুদ সাহেবের ফর্মুলায় পাঁচের অধিক জোট বাঁধলেই একটি আসন পাবেন। তাহলে দুটি জোট হতে হবে এই দুটি আসনকে বন্টন করতে হলে। নইলে মহিলাদের হাত পা কেটে টুকরো টুকরো করে সংসদে বসাতে হবে। সন্ত্রাসের এই যুগে এটাও বোধ হয় আর অসম্ভব হবে না। তখন বলা হবে এটাই তো আইন !! আইনে কি কোথাও বলা আছে যে কেউ যদি একজন মহিলা প্রার্থীর মনোনয়নের ক্ষেত্রে একমত না হতে পারেন, তাহলে প্রার্থীকে দা-বঁটি দিয়ে কেটে ফেলা যাবে না? আমার তো ভয় হচ্ছে। আরও ভয় হচ্ছে, না হয় আওয়ামী লীগ মহিলাই সীটে বসলেন, কিন্তু তাঁর আনুগত্য ভাগাভাগি করে সবাইকে দিতে হবে। নইলে তো তারা ক্ষিপ্ত হবে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত ও জাতীয় পার্টির মনোনীত মহিলারা তবুও একটি দল নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, আর এই ২জন মহিলাকে ১৩ জন সাংসদের কথামতো চলতে হবে। কী জ্বালার কথা!! ভাগবটোয়ারার ফর্মুলার দুর্গতি কেবল বুঝি শুরু। খেয়াল করতে হবে, যে বিলের ভাষায় মনোনয়ন নাই, আছে বন্টন। এখানেই আসল সমস্যা!! আমরা মনোনয়নও চাই নি, কিন্তু তার বিপরীতে আমরা পেলাম বন্টন। আরো অপমানজনক।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এই বিলটির ব্যাপারে কতখানি ভেবেছেন জানি না। মনে হয় কেউ নোট বই থেকে টুকে দিয়েছে আর তাই তিনি বিল বানিয়ে সংসদে পেশ করেছেন। এতো অপরিপক্ক চিন্তা ভাবাই যায় না। আবার তিনি এ ব্যাপারে মিথ্যে তথ্যেরও আশ্রয় নিচ্ছেন। পত্রিকায় তিনি বলেছেন তিনি নাকি ৩৬টি সভা করেছেন মহিলাদের সাথে। সেই সভাগুলোর একটি তালিকা পেলে ভাল হোত। গত আড়াই বছরে ৩৬টি সভা করেছেন বলে তিনি দাবী করছেন। কিন্তু কাদের সাথে? আর যদি করেও থাকেন, আমাদের জানা মতে প্রথম দিকে তিনি প্রত্যেক সভার ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই বলেছেন যে সরাসরি নির্বাচনের দাবীর সাথে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একমত। প্রথম দিকে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ সরাসরি নির্বাচনের বিল আনে নি, কিন্তু তিনি আনবেন। পরে তিনি তাঁর কথা বদলাতে শুরু করেছিলেন। ক্ষমতার জোর যতো টের পেতে শুরু কররেন ততোই তিনি গণবিরোধী এবং বিশেষ করে নারী বিরোধী কথা বলতে শুরু করলেন। এবং সেই সব সভাতে তাঁকে পরিস্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছিল যে নারীরা সরাসরি নির্বাচন ছাড়া অন্য কিছু মানবেন না। তাঁর আপত্তিকর কথার মধ্যে অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল নারীরা সরাসরি নির্বাচন করতে পারবেন না, কারণ তাঁরা ৫ কোটি টাকা কোথায় পাবেন! আমরা এই সব কথা টুকে রেখেছি। ভুলিনি একটিও। সময় মতো আমরাও ব্যবহার করতে পারবো। কাজেই ৩৬টি সভার কোথায় কি বলেছেন এবং তিনি কি শুনেছেন আমরা জানতে চাই। শুধু ৩৬টি সভা বললেই হবে না, এই সভায় কি বলা হয়েছে আমরা জানতে চাই। তবে তিনি যদি দলের নারীদের সভার কথা বলে থাকেন, তাহলে আমাদের অবশ্য কিছু বলার নাই। তবে আমি মনে করি জোট সরকারের পক্ষ হয়ে আইনমন্ত্রী যা করলেন তা তাঁদের দুর্বলতার লক্ষণ এবং এটাও মনে হয় যে তাঁরা মনে করছেন না যে আগামি নির্বাচনে তাঁদের পক্ষে জনগণ রায় দেবে। তাই এখনই যতোটুকু পাওয়া যায় তাই নেয়ার চেষ্টা বলেই আমার মনে হয়।

আমাদেরকে বোঝানো হয়, সরাসরি নির্বাচন দেয়া যাচ্ছে না, কারণ নির্বাচন করার অনেক খরচ লাগবে। এতো টাকা কোথা থেকে আসবে? অথচ অস্টম সংসদের মাঝামাঝি সময়ে ৪৫ জন মহিলা সাংসদদের ভাতা, গাড়ী-বাড়ী, সুযোগ সুবিধা দেয়ার কোটি কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? এটা কি একবোরে অপচয় নয়? এই টাকা যদি থাকে, তাহলে নির্বাচনের টাকা থাকবে না কেন? বলতে পারেন, যে নির্বাচনের খরচ অনেক বেশি।

বুঝলাম। কিন্তু দেশের এই দূর অবস্থায় মহিলা আসনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করে এবারই সংসদে সংরক্ষিত আসন দিতে হচ্ছে কেন? কী এমন দরকার, যার জন্যে দল নিজের ভাবমূর্তিও রক্ষা করতে পারছে না? এই চাপ কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই জনগণের পক্ষ থেকে নয় এবং যারা চাপ দিচ্ছেন তাঁরাও জনগণের সেবার জন্যে চাপ দিচ্ছেন না, তারা নিজেরাই সংসদে পণ্যের মতো ভাগ বাটোয়ারার মধ্যে গিয়ে আবার সংসদ ব্যবসার অংশীদার হতে চান। এছাড়া আমরা তো আর কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি না। আমি এই পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর পড়ছি তাতে যারা সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন চান তাঁদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মায় না। কারণ তাঁরা তদ্বির, ধর্ণা দেয়া, লবিং ইত্যাদিতে ব্যস্ত বলে জানা যাচ্ছে। এসব কথা কি খুব সম্মানজনক। অথচ এঁদের মধ্যে অনেকেই যোগ্যতার দিক থেকে কম নন, কিন্তু তাঁদের সংসদে আসার পদ্ধতিটাই তাঁদের যোগ্য করে তুলছে।

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী নারী আসন সংক্রান্ত অংশ কেন অবৈধ হবে না তার জন্যে হাইকোর্টের রুল আছে এবং বিষয়টি এখনো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। তাহলে এই বিল পাসের মধ্য দিয়ে হাইকোর্টের রুলের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করা হোল না? আইনমন্ত্রী কি আইন-আদালতও মানেন না?

আমাদের জন্যে ভালই হোল। আন্দোলন জোরদার করার জন্যে আমরা প্রস্তুত এবং রাজপথসহ আইনী লড়াই সবই আমরা চালিয়ে যাবো। যারা এভাবে সংসদে যাচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয় নারীদের সভায় খুব গ্রহণযোগ্য হবেন না। এটা দুঃখজনক। আশা করি বিএনপি এবং অন্যান্য দলের নারীরা এই বন্টনের মধ্যে যাবেন না। এবার তাঁরা যদি নিজেরাই এই আসনগুলো গ্রহণ না করেন তাহলে আগামি নির্বাচনে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা শতগুণ বেড়ে যাবে। সবাই তাঁদের সম্মান করবে। নারী নেত্রীরা তাঁদের বক্তব্য পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন আমরা এ বিল মানি না। কাজেই আন্দোলন চলবেই।

সংরক্ষিত আসন নিয়ে খালেদা-হাসিনার বক্তব্য

অষ্টম জাতীয় সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদ থেকে মহিলা সদস্যদের জন্যে ৪৫টি সংরক্ষিত আসন প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারিভাবে সংরক্ষণের সাংবিধানিক বিধান করে সংবিধান চতুর্দশ সংশোধন বিল ২০০৪ পাশ হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী মহিলা সদস্যদের আসনসহ মোট আসন হবে ৩৪৫টি। মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনগুলো পরবর্তী ১০ বছরের জন্যে বহাল থাকবে, তার সাথে এই সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদও যোগ হবে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে মহিলা সদস্যরা সংসদে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা সংসদের ভেতরেই থাকবে। বাইরে জনগণের মধ্যে আসছে না।

অনেক দিন ধরে এসব তামাশা চলছে, হাত নিশপিশ করছে কিছু লেখার জন্যে। কিন্তু আজকাল লেখার ইচ্ছেটাও মরে যাচ্ছে লজ্জায় ঘৃণায়। ক্ষেপে গিয়ে তক্ষুণি প্রতিবাদ করে লিখি নি। অসম্ভব খারাপ লেগেছে। কী দেশে বাস করছি আমরা যেখানে প্রধানমন্ত্রী নারী হওয়া সত্তেও ঠান্ডা মাথায় নারীদের দাবীকে উপেক্ষা করে চলেছেন? তিনি কোন এমন শক্তিশালী মহলের কথা শুনছেন যে সারা দেশের নারী আন্দোলনের কথা উপেক্ষা তো করছেনই নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতিও মনে রাখছেন না? বাজারে অবশ্য একটা গুজব আছে। সেটা হচ্ছে তাঁর দলেই তাঁর অতি ঘনিষ্টজনেরা সরাসরি নির্বাচনের ঘোর বিরোধী তাঁদের কথাতেই নাকি তিনি নারীদের দাবী মানছেন না। এটা সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু এই গুজব বাজারে এখন এসে গেছে। কারণ বিএনপির অনেক মন্ত্রীও বলেন তাঁরা নীতিগতভাবে একমত। এমনকি আইনমন্ত্রী নিজেও বহু সভা সেমিনারে সরাসরি নির্বাচনের বিল আনার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এমনও শোনা যায় তিনি নাকি করতে চান, কিন্তু বিএনপির একটি মহল করতে দিচ্ছে না।

১৯৭২ সালের সংবিধানে যে কারণে আসন সংরক্ষণ এবং মনোনয়নের কথা বলা হয়েছিল ৩০ বছর পর যখন নারীরা এর পরিবর্তন চাচ্ছেন তখন তাদের দাবীকে উপেক্ষা করে আসন সংরক্ষণ রাখা এবং আবারো মনোনয়ন দেয়া কি নারী অধিকার হরণ করা নয়?

নারী আন্দোলন আসন সংরক্ষণের কথা বলেছে মাত্র ১০ বছরের জন্যে, দুটি মেয়াদ পর্যন্ত। অর্থাৎ এটাই একমাত্র লক্ষ নয়। আসল লক্ষ হচ্ছে নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতা করতে পারার মতো প্রস্তুত হওয়া। নারীদের জন্যে আসন যদি সংরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। যদি সরাসরি নির্বাচন দিতে সমস্যা থাকে আসন সংরক্ষণ না রাখাই ভাল। এটা আমরা অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কাজেই কেউ যদি আমাদের ভুল বুঝে থাকেন তাঁদের বলে দিচ্ছি একটি আসন থাকলেও সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। আওয়ামী লীগ তো সে কাজ করে দিয়েই গেছে। তাঁরা তো আসন বিলোপের পবিত্র কাজটি করে দিয়ে গেছেন। সংসদ আরাম করে নারী মুক্ত অবস্থায় ছিলে।

এতো কথা বলার পরও আমাদের দুই নেত্রী দু'রকম বুঝছেন। তাঁরা মনে করছেন আমরা আসন চাইছি। তাই একজন তো ৩০টি আসন বাড়িয়ে ৪৫ করলেন। ধন্যবাদ। তাঁর ক্ষমতার জোর এতোটুকুই বোঝা গেলো। নারীরা যা চেয়েছিল তার ধারে কাছে না গিয়ে তাঁর দল যা ভাল মনে করেছে তাই দিয়ে দিলেন। আমাদের ধন্য হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের জন্যে পন্ডস ও রাঁধুনির মতো আর একটি উপহার! একদিকে আমাদের নিয়ে কোম্পানী ব্যবসা করে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নারীদের প্রতি অবমাননা করছে।

আবার ক্ষমতাসীন দলের এই কাজ বিরোধী দলকে খুব মজার একটি সুবিধা করে দিয়েছে। বিরোধী দলে থাকা আওয়ামী লীগ শুরু থেকে নির্বাচনে হেরে যাওয়াকে মেনে নেয় নি। তাও দু' বছর চুপ করে ছিল কারণ জনগণ নির্বাচন ঠিক হয় নি বললে শুনছে না। দিন যতোই বেড়েছে জোট সরকারের অপকর্মগুলোও বাড়ছে, জনগণ বিরক্ত হচ্ছে। এরই মধ্যে নারী আসন নিয়ে তো নারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ। তা এই সুযোগে আওয়ামী লীগও আমাদের কাছাকাছি চলে আসলেন। কী আর করা। দাবী তো সকলের। আমাদের আন্দোলনের সাথীরাও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। আফটার অল একটা বড় দল। আওয়ামী লীগের অনেক নেত্রীরাও শহীদ মিনারে অনশন পর্যন্ত করেছেন। অথচ আমি বুঝি না এই কাজটি যদি ২০০১ সালের আগে করতেন তাহলে আমাদের এতো কষ্ট পোহাতে হতো না। তখন আওয়ামী লীগ সরকারের আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু আমাদের কথা কোন মতেই শুনবেন না। ভাল কথা। আইভী রহমানের কথা নিশ্চয় তিনি শুনতেন!! কথায়

বলে সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। মহিলা আওয়ামী লীগের দশা হয়েছে তাই। অতএব এখন অনশন ছাড়া পথ নাই। কী কষ্ট!

কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলাম বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতা শুনে। ভাগ্য ভাল নিজের কানেই শুনেছি। অবশ্যই টিভির খবরে। তিনি যুব আওয়ামী দলের সভায় পরিস্কার ভাষায় বললেন, আমরা চেয়েছিলাম ১০০টি সীট, তিনি আমাদের দিয়েছেন মাত্র ৪৫টি সীট ইত্যাদি। নারীরা ভিক্ষা চায় নি.....। শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম পরের বাক্যটি শোনার জন্যে। আমাদের জন্যে এই বাক্যটি হচ্ছে সরাসরি নির্বাচনের। শেখ হাসিনা দ্রুত অন্য কথায় চলে গেলেন। সরাসরি নির্বাচনের কথা বেমালুম চেপে গেলেন। হয়তো মনে করেছেন আমরা কেউ খেয়াল করবো না। কিন্তু না, ঐ একটি কথা শোনার জন্যে আমাদের কান খাড়া হয়ে থাকে, চোখ বড় বড় হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জোটে অন্য কথা। একজন বলেন না, একজন দেন না।

নয়টি সংরক্ষিত আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ চিৎপটাং

মাঝে মাঝে জানা কথা বাস্তবে ঘটতে দেখলেও অবাক হতে হয়। অবাক নয় শক্ত হতে হয়। তেমনি একটি শকিং খবর ছিল আওয়ামী লীগ নারী আসনের ভাগ নেবে। তারা সংসদে গেছে শুনে খুশি হবার সাথে সাথেই এই স্তম্ভিত হবার মতো খবর। এতোদিন মহিলা আওয়ামী লীগের এতো আনন্দ এবং শেখ হাসিনার এতো কথা বাতাসে হাওয়া হয়ে গেল। একেবারে চিৎপটাং। মাত্র ৯টি আসন তারা পাবেন, এবং সেটা তাঁরা নেবেন। আজকের কাগজের খবর হচ্ছে, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'ছাড়বো কেন? যা পাব তাই গ্রহণ করবো। কারণ হিসেবে এর চেয়ে ভাল আর কি কারণ থাকতে পারে!

অস্টম সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, ৩০ থেকে ৪৫ পর্যন্ত। আনুপাতিক হারে এই আসনগুলো ভাগবাটোয়ারা হবে সংসদে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। এরই মধ্যে জাতীয় পার্টি মাত্র একটি কি দুটি পাবে বলেই

রওশন এরশাদ তাতে সায় দিয়ে বসলেন। তাও জাতীয় পার্টির নারী সদস্যদের ভাগে এই আসনটি যাবে বলে মনে হচ্ছে না। স্বয়ং বিদিশা [1] এই আসনটি দখল করবে, এবং এরশাদ সে জন্যেই সমর্থন দিলেন। কী লজ্জা!! বলিহারি রওশন এরশাদকে যিনি নিজের আত্মমর্যাদাটুকু পর্যন্ত রাখতে চান না। রাজনীতি এমন নিম্ন স্তরে নেমেছে ভাবতে কষ্ট হয়। সংসদে নারী আসন সংরক্ষণের জন্যে যারা আন্দোলন করছেন, তাঁরা কি বিদিশাকে বসাবার জন্যে এই আন্দোলন করেছেন নাকি যারা সংসদে বসে নারীর স্বার্থ রক্ষা করবে তাঁদের সেখানে জনগণের ভোট নিয়ে যাবার জন্যে করেছেন। প্রহসন আর কাকে বলে!!

এই বিলটি পাশ হবার সময় আওয়ামী লীগ সংসদে আসে নি। কিন্তু তাতে কি? জোট সরকারের হাতে দুই-তৃতীয়াংশ আসন রয়েছে। তাঁরা যা খুশী তাই করতে পারেন। এখন বুঝলাম কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সংসদে বসে একনায়কতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত করা। তখন তাঁরা জনগণের কথা যেখানে দিব্যি ভুলে যেতে পারেন সেখানে নারীদের দাবীর কথা মনে থাকবে এমন আশা করা যায় না। এখন যখন আওয়ামী লীগ সংসদে গেছে, অনেকেই বলছেন, আচ্ছা তাঁরা যখন সংসদে গেলেনই চতুর্দশ সংশোধনীর সময় গেলে কী হতো না? তাহলে তাঁরা তাদের মতামত দিতে পারতেন। না, এখন মনে হচ্ছে আসলে আওয়ামী লীগ চেয়েছে বিলটি পাশ হোক, এবং বিএনপির ওপর তারা সরাসরি নির্বাচন না দিয়ে দেয়ার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সুবিধাটুকু ভোগ করতে চেয়েছেন। হোক না ৯ টি আসন, অর্থাৎ ৪৫ নারী আসনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। তবুও আসন তো! এর সাথে পাজেরো গাড়িসহ কতো সুযোগ সুবিধার সম্পর্ক রয়েছে!! জনগণের ভোটের বালাই নাই, নির্বাচনী এলাকার প্রশ্ন নাই। এমন আরামের আসন একটা হলেও মন্দ কি।

বিএনপি মহিলা কর্মীদের মতোই আওয়ামী লীগের ভিতরেও নাকি জোর তদবির শুরু হয়ে গেছে। তবে এও শুনেছি, অনেকেই অনীহা প্রকাশ করেছেন। এখন মাত্র ৯ টি আসন দেবেনই বা কাকে। এতো ছোট তালিকার

[1] বিদিশা হুসেইন মুহাম্মা এরশাদের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং একজন ফ্যাসন ডিজাইনার

মধ্যে কাকে দেবেন আর কাকে দেবেন না সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন। বড় কষ্ট হবে নেত্রী শেখ হাসিনার। পরে দলের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হবে বলেই মনে হয়।

কেন এই আসন নিচ্ছেন কিংবা নারী সংগঠনগুলো অনুরোধ করলে এই আসন আওয়ামী লীগ প্রত্যাখান করবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আওয়ামী লীগের নেতারা দিতে পারবেন না। আওয়ামী সরকারের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছেন তিনি তো পারবেনই না, এমনকি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলও দিতে পারবেন না। তাহলে কে দিতে পারবেন? অবশ্য সে কথা তিনি বলেন নি। তবে আক্কলমন্দ কে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়....

বিএনপি সরকার আসার পর থেকে সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের কথা বার্তা অনেক শুনেছি। তবে কখনোই বিশ্বাস করি নি যে তাঁরা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন চান বা নিজেরা দেবেন। তারা সে সুযোগ তাঁদের আমলে ২০০১ সালে পেয়েও নেন নি। দুই-তৃতীয়াংশ আসন সংখ্যা ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সরাসরি নির্বাচনের বিল উত্থাপন করা যাবে না, এমন কথা নাই। লক্ষ্য করেছি শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যগুলোতে আসন সংখ্যা ১০০ করার কথা যতো উঁচু গলায় বলেন সরাসরি নির্বাচনের কথা তেমন করে বলেন না, কখনো একেবারেই এড়িয়ে যান। কাজেই তাঁকে খালেদা জিয়ার মতো করে অভিযুক্ত করতে পারবো না যে তিনি নিজ মুখে বলেছেন।

তবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছে। সভানেত্রীর অনুমোদন ছাড়া নিশ্চয় নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরী হয় নি। কাজেই তিনি বলেন নি এ কথাও বলা যাবে না। তবুও আমি কখনোই বিশ্বাস করতে পারি নি। গত ছয় মাসে মহিলা আওয়ামী লীগ বিশেষ করে আইভী রহমানের নেতৃত্বে অনেক মানববন্ধন হয়েছে, মিছিল হয়েছে। তিনি অন্য নারী সংগঠনের সাথে জোট বেঁধে বিশেষ করে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাথে শহীদ মিনারে অনশন পর্যন্ত করেছেন। এতে আমাদের সাথী অনেক সংগঠন সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। বলেছেন তাঁরা অবস্থান বদলেছেন। এমনকি এও বলেছেন শেখ হাসিনাও নাকি উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি এখন সরাসরি নির্বাচন চান। কাজেই তাঁর সাথে আমরা থাকবো। যদিও আমরা জানি ১৯৮৭ সালেই ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ যখন ১৭ দফা দাবির মধ্যে সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব রাখে তখন আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন মহিলা সমিতি এর সাথে

একাত্মতা ঘোষণা করে নি। কাজেই সেই ইতিহাস জানলেও মহিলা আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের আন্দোলনকে নির্ভরযোগ্য ধরা যায় না। মনে হয়েছে পার্টি এই সময় এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। সম্মিলিত নারী সমাজ তাই এই আন্দোলনে যোগদান না করে নিরপেক্ষ এবং নির্দলীয় অবস্থান থেকে সরাসরি নির্বাচনের দাবী অব্যাহত রেখেছে।

আরোও মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে পার্লামেন্ট জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সভায় আমাদের কথার সাথে সুর মিলিয়ে সে কি বক্তৃতা দিলেন!! আমরা প্রাক্তন এবং বর্তমান দুই আইনমন্ত্রীর তর্ক-বিতর্কে অতিষ্ট হয়ে গেলাম। তার মাত্র দু'তিনদিন পরেই বিলটি সংসদে পাশ করা হোল। মনে হয় প্রাক্তন আইনমন্ত্রী তাঁর নেত্রীর ব্রিফিং নিয়ে যান নি। তাই তাঁর যা মনে হয়েছে তা বলেছেন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী সংগঠনের দাবির পক্ষে বলার চেয়েও মওদুদ আহমদকে বেকায়দায় ফেলাটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। এতে কাজ হয়নি, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ যথেষ্ট ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আমি অন্য একটি লেখায় সেই বর্ণনা দিয়েছি।

আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্ত শুধু নারী সংগঠনগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই নয়, তাঁদের নিজের দলের নারী সংগঠন বিশেষ করে মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিও চরম অবমাননা। খুবই উপযুক্ত সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক উপ-কমিটির একটি মতবিনিময় সভা ডেকেছেন এবং সেখান থেকে পরিষ্কার সুপারিশ এসেছে সরাসরি নির্বাচন না দিলে সংরক্ষিত আসন প্রত্যাখান করার। অর্থাৎ সকল দিক বিবেচনা করে নারী নেত্রীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। জানি না আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই সুপারিশের কোন মূল্য আছে কি না। তবে এই সিদ্ধান্ত দেখে অন্তত আমরা খুশি হয়েছি যে নারী নেত্রীরা তাঁদের কথায় হেরফের করছেন না। আমি নিজেও আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গেছি কারণ মনে হয়েছে এই সময় এই মত বিনিময় একান্ত জরুরী। আমরা সত্যিকার অর্থেই সংকটময় অবস্থার মধ্যে যাচ্ছি। নির্দলীয় অবস্থান থেকে আমরা সব সময় কাজ করতে চেয়েছি, নারীদের ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করার করার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি। অনেক সময় মনে হয়েছে সংরক্ষিত আসন নিয়েও দলীয় রাজনীতি হচ্ছে, তখন নিরাপদ দূরত্বে থেকেছি। সম্মিলিত নারী সমাজ

এই অবস্থানে রয়েছে। সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে কোন প্রকার আপোষ না হোক, এটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া।

সংরক্ষিত আসনের 'বিশেষ সুবিধা' আসলে কার?

জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০ আর নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০টি, অর্থাৎ মোট ৩৫০ টি আসন রয়েছে। কিন্তু সামনে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এতো বিতর্কের মধ্যে যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে কোন আলোচনায় আসছে না, সেটা হচ্ছে নির্বাচন আসলে কত আসনে হচ্ছে? জানি, অনেকে বলবেন, এখানে বলাবলির কি আছে, ৩০০ আসনে নির্বাচন হয়ে নির্বাচিত সদস্যরাই নারীদের মনোনয়ন (তাঁদের ভাষায় নির্বাচিত করে) দেবেন! সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নারী আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের দাবী উপেক্ষিত হচ্ছে ক্রমাগতভাবে।

হ্যাঁ, দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এটাই নিয়ম সাংবিধানিকভাবে। ১৯৭১ সালে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর একটি স্বাধীন দেশ হিশাবে আমরা যে সংবিধান পেলাম তার 'পঞ্চম ভাগ' আইনসভার ধারা ৬৫(১) এবং ৬৫(২) -এ সাধারণ আসনের কথা বলা হয়েছে। মুশকিল বেঁধেছে ৬৫(৩) ধারা নিয়ে, যেখানে বলা আছে,

৬৫। (৩) এই সংবিধানের প্রবর্তন হইতে দশ বছর কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে,এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না। অর্থাৎ মহিলারা অবশ্যই সাধারণ আসনে নির্বাচন করতে পারবেন। সাধারণ আসন নারী-পুরুষ সবার জন্য, আর সংরক্ষিত আসন শুধুই নারীদের জন্য।

বর্তমান সংসদ তার একটি ভাল উদাহরণ যেখানে সাধারণ আসনেও নারী আছেন, আর সংরক্ষিত আসনে তো বটেই। এখন মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৯ জন নারী পুরুষ প্রার্থীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই নির্বাচন করে এসেছেন, যা মোট আসনের মাত্র ৬% । এক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে আমরা পিছিয়ে আছি। আর ৫০টি সংরক্ষিত আসন ধরে ৩৫০টি আসনের মধ্যে নারীদের মোট সংখ্যা হয় ৬৯ জন, যা মোট আসনের ১৯%।

যে কয়জন সাধারণ আসনে জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন ৪ জন। কাজেই ইমেজের দিক থেকে দেখতে গেলে নারীদের জন্যে এই আসন দেশের জন্যে ভাল। কিন্তু আসল চিত্র কি তাই?

শুরুতেই বলে রাখি জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন নিয়ে কথা বলার অর্থ এই নয় যে যারা সেখানে যাবেন, আমরা ধরে নিচ্ছি যে তাঁরা জনগণের পক্ষে এবং বিশেষ করে নারীদের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করে দেবেন। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাজনৈতিক দল এবং তাঁদের আদর্শের ওপর। নির্বাচন এবং গণতন্ত্র যে এক কথা নয় সে ভ্রম আমাদের নিষ্ঠুরভাবে ভেঙ্গে গেছে। নারী হিসেবে বুঝেছি আরও কঠিনভাবে। আমরা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় প্রধান পেয়েছি নারী; স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, শ্রম-অর্থাৎ বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল স্থানেই নারীদের পেয়েছি। কিন্তু হায়! সমাজটাই যেখানে পুরুষতান্ত্রিক, এরা সেই কাঠামোতে গিয়ে নারীদের স্বার্থ বলি দিয়ে দিলেন। কাজেই কোন আশা নিয়ে নয়, জাতীয় সংসদের এই আসনগুলোর একটা মীমাংসা হওয়া দরকার,সে কারণেই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। আমাদের সাফ কথা হচ্ছে যদি জনগণ তাঁদের নির্বাচিত না করতে পারে তাহলে বোনাস এবং বিশেষ সুবিধার আসনের দরকার কী?

একটু পেছেনের দিকে যাওয়া যাক। স্বাধীন দেশে শুরু হোল নারীদের প্রতি 'বিশেষ দৃষ্টিতে' জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণের ব্যাপারটি। নিয়ত ভাল ছিল কিন্তু ফলাফল দাঁড়িয়েছে ভিন্ন। রাজনৈতিক দলের নারী কর্মীদের নিজেদের মতো করে নির্বাচনী এলাকায় কাজ না করে বসে থাকলেই হবে। দল সংখ্যাগরিষ্টতা পেলে তাদের ভাগে আসন জুটে যেতে পারে, সেই আশায় (গোঁফ তো নাই)মাথার চুলে তেল দিতে থাকবে। আজকাল নারী আসনের জন্যে প্রার্থী সংখ্যা বাড়ছে, তাই বাড়ছে প্রতিযোগিতা। কিন্তু যেহেতু ভোটার এর সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই তদবির ও তোয়াজ করে নেতাদের কাছে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে। এটা কি অপমানজনক নয়?

জাতীয় সংসদে সদস্য সংখ্যা প্রথম ১০ বছরের জন্য ৩০০ আসনের সাথে নিবার্চিত সংসদ সদস্যদ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন ১৫ জন নারী। মোট সদস্য সংখ্যা হোল ৩১৫। সে সময় সাধারণ আসনে কোন মহিলা ছিলেন না, তাই মনে করা যেতে পারে এই ১৫টি আসন সংরক্ষিত না থাকলে মহিলাদের জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণ শুরুই করা যেতো না। এটা ছিল বিশেষ মেয়াদের জন্য 'বিশেষ সুবিধা'। ধারণা করা হয়েছিল যে ১০ বছর অর্থাৎ সংসদের

দুটি মেয়াদ পূর্ণ হবার পর মহিলাদের এই ধরণের বিশেষ সুবিধা আর না দিলেও চলবে। এরপর তাঁরা সাধারণ আসনের নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে পারবেন। সেটা অবশ্যই পারতেন যদি বিশেষ সুবিধাটা সরাসরি নির্বাচনের আওতায় আনা হোত। কিন্তু সেটা করা হয় নি, পরিণতি হয়েছে এই যে, নারীদের শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বে আনার চেষ্টা করা হয় নি, দু'একজন আসতে পারলেও বেশীর ভাগ থেকে গেছেন দয়া বা করুণার ওপর। শিশু যতদিন হাঁটতে শেখে নি তত দিন কোলে নিতে হয়,বয়স বাড়ছে কিন্তু কোল থেকে না নামালে হাঁটবে কীভাবে?

এখন ২০১২ সাল, চলছে নবম জাতীয় সংসদ। দুঃখ এবং লজ্জার সাথে বলতে হচ্ছে সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত করা হয় নি,বরং বেড়েছে। আগে ৩০০ জন মিলে ১৫ জনকে মনোনীত করতেন, এখন করতে হয় ৫০ জনকে। এর মধ্যে সরাসরি নির্বাচনের দাবীর পর একটু গণতান্ত্রিক হয়েছে এইভাবে যে আগে শুধু একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ট দল করতো, এখন আনুপাতিক হারে বিরোধী দলও মনোনীত করতে পারে। তাই নবম জাতীয় সংসদের শুরুতে ৪৫টি আসনের মধ্যে বিরোধী দল ৫টি আসন লাভ করেছে। কিন্তু মাঝখানে এসে যখন সরকারী দল আরও ৫টি আসন বাড়ালো তখন তার ভাগ আর কেউ পেলো না। এটা যেন সরকারী দলের এখতিয়ার। অর্থাৎ নারীদের জন্যে বিশেষ সুবিধা বলা হলেও দলের জন্যেই বোনাস বা দলের বিশেষ সুবিধা ছাড়া আর কিছুই নয়। দলের অনেক নারী কর্মী নেতৃত্বের পর্যায়ে এসেও কোন স্বীকৃতি পান না। স্বীকৃতি মানে একটি আসন দিয়ে দাও। মন্দ কী?

এ কথা বলতেই হবে যে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে সংসদে নেতৃত্বদানকারী বা সংখ্যাগরিষ্ট দলের বেশ লাভ হয়। এই নারী সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে সংসদের অধিবেশনগুলোতে আসেন, সাধারণ আসনের সদস্যদের 'অন্য' কাজ বেশী। সংসদ নেত্রী উপস্থিত থাকলে সাধারণ আসনের সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা বাড়ে, নইলে বিরোধী দলের মতোই তাঁরাও 'নিয়মিত বর্জন' করে চলেন। টেলিভিশনে সংসদ চেনেল থাকায় এই বিষয়টি আমরা দেখতে পারি। সংসদে নারীরা না থাকলে মাননীয় স্পীকারকে শূন্য আসন সম্বোধন করেই কথা বলতে হোত। নারী সদস্যদের ক্ষমতা বা সুযোগ নাই তেমন কিছু করার, কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন করছেন,নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা না থাকলেও যার যার জেলার উন্নয়নের কথা বলছেন। নেতা নেত্রীর গুনগান করছেন। জাতীয় সংসদ সদস্য হিশেবে সমাজে

সমাদৃত হচ্ছেন, বিশেষ বা প্রধান অতিথি হয়ে অনুষ্ঠান করছেন। আমি যতোবার নিজে সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের সভায় গেছি, আমি তাঁদের আন্তরিকতা দেখেছি, দেশের জন্যে কাজ করার মানসিকতাও দেখেছি। কিন্তু একই সাথে দেখেছি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না পারার অসহায়ত্ব।

আমি জানি না,হয়তোবা তাঁরা এ কথা স্বীকার নাও করতে পারেন, কিন্তু 'ক্ষমতাহীন' বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সংসদ সদস্য হয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের স্বাদ কতটুকু ভোগ করতে পারছেন, এই কথা তাঁদের বলার সময় হয়েছে। তাঁরা সংসদ সদস্য,অথচ নীতি নির্ধারণীতে তাঁদের কথা কতটুকু শোনা হয় বা গুরুত্ব দেয়া হয়? সাধারণ আসনের সদস্য যারা বহু টাকা খরচ করে এবং ভোটারের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোট চেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের কাছে এই সংসদ সদস্যদের গুরুত্ব নাই। তাঁরা তো ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। তাদের মনোনয়ন দিয়েছেন দলের নির্বাচিত নেতারা। তাহলে কাদের কাছে দায়বদ্ধ তাঁরা? জনগণ তো নয়ই এমন কি নারীদের প্রতিনিধিত্বও তাঁরা করছেন না। এটা তো তাঁদেরই ব্যক্তিগতভাবে 'বিশেষ সুবিধা' পাওয়া জনপ্রতিনিধি হবার সুযোগ তো বন্ধ করে রাখা হয়েছে সংবিধানেই। এভাবেই কি চলবে এবারের নির্বাচনেও?

বিশেষ সুবিধার অসুবিধা হোল যে একবার শুরু করলে বন্ধ করা যায় না। কারণ এর সাথে গোষ্টি-স্বার্থ যুক্ত হয়ে যায়। তাই যে উদ্দেশ্যে প্রথম আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল পরবর্তিতে তা আর সেভাবে থাকে নি। যাদের জন্যে করা তাদের মধ্যে ভাব এই যে এই পদ্ধতিতে সহজভাবে পাওয়ার বিষয় হয়ে গেছে। অন্যদিকে বড় রাজনৈতিক দলগুলো ধরেই নেয় যে ৩০০ আসনে যে কোন একটি দলের সংখ্যাগরিষ্টতা থাকবে এবং তারাই এই বোনাসের ভাগ পাবে। ১৯৯১ সাল থেকে বিএনপি-আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে পালা করে, এবং এই আসন নিয়ে তাদের মতো করে সংবিধান পরিবর্তন করেছে, কিন্তু সরাসরি নির্বাচন নিয়ে নারী আন্দোলনের দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। এমন কি নির্বাচনী ইশতিহারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করে নি। সংরক্ষিত আসনে তিনটি দিক আছে। একঃ আসন সংখ্যা, দুইঃ মেয়াদ এবং তিনঃ নির্বাচন পদ্ধতি। প্রথম দুটি বেড়েছে ১৯৭৮ সাল থেকে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে প্রথমে আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এবং মেয়াদ ১০ থেকে ১৫ বছর বাড়ানো হয়। ১৯৮৭ সালে প্রথম ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আবারো ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়।

সংবিধান (দশম সংশোধন)-আইন, ১৯৯০ প্রবর্তন কালে আবার ১০ বছর বাড়ানো হয়।

স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় থেকে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ ১৯৮৭ সালে প্রথম দাবী করেছে, সংরক্ষিত আসন ২টি মেয়াদ আরো রাখা যেতে পারে তবে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ আসনে মনোনয়ন দিতে হলে কমপক্ষে ২০% মনোনয়ন দিতে হবে। সাধারণ আসনে নারীদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন না দেয়ার কারণ হিশেবে বলে হয় নারীদের নাকি টাকা ও মাস্তান পাওয়ার নাই। কাজেই জিতবে না। রাজনৈতিক দলগুলো ধরে নেয় যে নারী কর্মীদের জন্যে তো সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এখন দলের জন্যে কাজ করুক, জিতলে একটি আসন দিয়ে দেয়া যাবে।

নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের এজেণ্ডা কি? নির্বাচন কমিশন কি ৫০টি সংরক্ষিত আসনের মালিকানা সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে সঁপে বসে আছেন? এই আসনগুলোর সাথে যদি জনগণের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে এই আসন রাখার দরকার কি? এই আসনের নির্বাচন সরাসরি হলে শুধু রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়, নারী আন্দোলন কর্মীরাও অংশ নিতে পারেন এবং জনগণের ভোট নিয়ে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন।

আমরা রাজনৈতিক দলের কাছে আর দাবী করবো না, কারণ তাঁরা বেইমানী করেছে। নির্বাচনের কমিশনের কাছেই আমাদের প্রশ্ন, এবারের নির্বাচন কত আসনের হচ্ছে? বিশেষ সুবিধা কারা এবং কিভাবে পাচ্ছে?

[২০১২ সালে লেখা]

নারীর অবমাননা ও জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের 'নীরবতা'

দেশে নারী অবমাননার ঘটনা ঘটছে, নারীর প্রতি অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করা হচ্ছে, খুব সহজেই ধর্ষণের হুমকি দেয়া হচ্ছে। সাধারণত রাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে এবং পরিবারে নারী নির্যাতন এবং অবমাননার ঘটনা দেখা যায়। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলে বিচারের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ক্রমেই দেখা যাচ্ছে নারী নির্যাতন এবং অবমাননা ঘটছে ক্ষমতাশীন দলের কর্মী, নেতা

এবং এমনকি আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাও জড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যখন সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য এবং সংসদ সদস্যদ্বারা নারীর অবমাননা ঘটছে। এসব দেখে এবং শুনে আমরা আতংকিত হচ্ছি।

লক্ষ করার বিষয় যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবাদ হচ্ছে প্রচুর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিবাদে গরম হচ্ছে। নারী সংগঠন এবং নেত্রীরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে বিবৃতিও দিচ্ছেন। কিছু পত্রিকায় ছাপা হয়, মূল ধারার পত্রিকা পাশ কেটে যায়, তার মূল কারণ যারা এসব অপরাধ করছে তাঁরা ক্ষমতার সাথে যুক্ত। প্রতি মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কিংবা ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত কেউ হলে তো কথাই নাই। সবাই চুপ হয়ে বসে থাকছে। এমনকি অনেক সামাজিক ও নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও মুখ খুলছেন না। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা এখন বাংলাদেশ ৫০ বছরের বিজয় দিবস পালন করছি। আমরা কথায় কথায় বলি ৩০ লাখ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানীর বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই কথায় যদি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এই বাংলাদেশের মাটিতে কি করে এতো নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অশ্লীল ও অশালীন আচরণ থাকতে পারে? একটি স্বাধীন দেশের নারী কেন ক্রমাগতভাবে অবমাননার শিকার হবে?

সবার প্রতিবাদ হলেও জাতীয় সংসদে এর কোন প্রতিফলন না দেখে প্রশ্ন জাগে, জাতীয় সংসদ আসলে কাদের জন্য? মোট ৩৫০ আসনে সংসদে ৭৩ জন নারী সদস্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত এবং সংরক্ষিত আসনে আছেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংসদে আইন প্রণেতা হিশেবে বসতে পারা অবশ্যই বড় ধরণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়। জাতীয় সংসদে পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক জনগণের প্রতিনিধি হিশেবেই বসেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে সংসদ সদস্য বলতে পুরুষরাই ছিলেন। জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে পুরুষদের আধিপত্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণেই ছিল, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। রাজনীতিতে নারী-পুরুষের অসম প্রতিযোগিতা ও সুযোগের কারণে নারী সংসদে বসতে পারেন নি, এখনও সেই অসুবিধা রয়ে গেছে। এখন যুক্ত হয়েছে টাকার জোর এবং পেশী শক্তির প্রতিযোগিতা। তাই দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার চিন্তা অবশ্যই ইতিবাচক ছিল। নারীদের জাতীয় সংসদে আনতে হলে, সাময়িকভাবে হলেও, তাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। সেটাই করা

হয়েছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানের ৬৫(২) ধারায় জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসন এবং ৬৫(৩) ধারায় ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্যে "সংরক্ষিত" রাখা এবং এই ১৫ জন আইনানুযায়ি পুর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল। এবং এই সুবিধা প্রথম ১০ বছরের জন্যে রাখা ছিল। কিন্তু ৩১৫ আসনের সংসদ হলেও ১৫টি আসনের নির্বাচনের ভার জনগণকে দেয়া হয় নি। ধারণা করা হয়েছিল ১০ বছর অভিজ্ঞতা অর্জন করে এই নারীরা সরাসরি নির্বাচন করতে পারবেন, কারণ সাধারণ আসনে নির্বাচন করতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু দশ বছর পার হবার আগেই ১৯৭৮ সালে এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ এবং মেয়াদ ১৫ বছর করা হয়, অর্থাৎ ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত করা হয়। এখানেই বড় ধরণের ভুল হয়ে গিয়েছিল। মেয়াদ ও আসন সংখ্যা বাড়ানোর সাথে নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন জরুরি ছিল। নারীদের জন্যে আসনগুলো সরাসরি জনগণের ভোটে বা নারীদের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে করার বিধান শুরু থেকে থাকলে সংরক্ষিত আসন থাকলেও সেখানে নারী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার বাধ্যবাধকতা থাকত।

এরই মধ্যে অনেক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। যারা এই আসন নিয়ে ভেবেছিলেন তারা আর ক্ষমতায় ছিলেন না, ফলে যে সরকার এসেছে তারা নিজের মতো করেই সংরক্ষিত আসনে নারীদের বসিয়েছেন। বসাবার দায়িত্ব ছিল পুরুষ সদস্যদের ওপরই। তারা এই আসনগুলোকে জাতীয় সংসদে নিজের দলের বোনাস হিশেবেই দেখেছেন। এই বোনাস সদস্যদের নিস্ক্রীয়তা স্বৈরশাসনের আমলে জেনারেল এরশাদের চোখেও লেগেছিল। তিনি এই আসনগুলোকে "একসেট অলংকার" আখ্যায়িত করে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন।

এরপর বারে বারে গণতান্ত্রিক সরকার এলেও ১৯৯১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বড় দুটি দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতার পালা বদল করেছেন, এবং সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত আসন সংখ্যা ৫০ হয়েছে। কিন্তু কেউই নির্বাচন পদ্ধতি পালটান নি। তাঁরা তাঁদের দলের নারী নেত্রীদেরকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। শুধু এখন পার্থক্য হয়েছে এই টুকুই যে আগে সংখ্যাগরিষ্ট দল সকল আসনের মালিক হয়ে যেত এখন তার আনুপাতিক হারে সংসদে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলও দু'একটি আসন পাচ্ছে। তাই এই সংসদে ৫০ আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি, জাতীয়

সমাজতান্ত্রিক দল ও বিএনপির নারী সদস্যও আসন পেয়েছেন। ইন্টার পার্লামেন্টরি ইউনিয়নের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদে মোট ৭৩ জন নারী সদস্য আছেন, যা মোট আসনের মাত্র ২০%; তার মধ্যে ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের বা পরোক্ষ নির্বাচিত। তাদের বাদ দিলে সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য মাত্র ২৩ জন। পৃথিবীর অনেক দেশেই জাতীয় সংসদে নারীর সংখ্যা ১০% কম, সেদিক থেকে সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান খুব খারাপ নয়।

কিন্তু পরিসংখ্যানে বাড়লেও কোন মতেই সংরক্ষিত ৫০টি আসন গুনগত ভাবে পিছিয়ে আছে। এই আসনগুলোতে মনোনয়ন পাবার জন্যে বিশাল লাইন ধরে, তদবীর হয়, তাবেদারীতে যে বেশি ভাল তার স্থান আগে হয় – এসব চলছে। প্রতিটি বড় দলে নারী সদস্য আছেন, তারা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন এবং দেশের ও জনগণের জন্যে তাঁদের ভাবনাও আছে। কেউ কেউ নারী আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। তাই আমি বলতে চাই যে এই আসনে যারা বসেছেন তাঁরা সবাই 'অ-যোগ্য'' নন; বরং বলতে হয়, তাঁদের যোগ্যতা ব্যবহারের কোন সুযোগ নাই। সরকার দলীয় নারী সংসদ সদস্যরা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে কথা বললে টেবিল চাপড়ে সম্মতি জানাতে পটু হয়ে গেছেন। কেউ কেউ কোন নিয়ে বক্তব্য দিতে গেলে লিখিত তোষামোদী বক্তব্য পাঠ করেন, যার মধ্যে নারীর প্রসংগ কদাচিৎ থাকে।

তবুও প্রশ্ন উঠছে, আজ যখন একজন প্রতিমন্ত্রী এবং একই সাথে সংসদ সদস্য নারীর বিরুদ্ধে এতো অবমাননা করেন, সেখানে এই ৭৩ জন নারী সদস্যরা কী করে চুপ হয়ে থাকেন? তাঁদের নীরবতা প্রমাণ করে তাঁরা জাতীয় সংসদে নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বসেন নি, বসেছেন দল এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে। তাঁরা কি বলতে পারেন না যে এই ধরণের পুরুষ সব নারীর সম্মানের জন্যে হুমকি? তাঁরা কি ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা দলগত ভাবে কোন বক্তব্য দিতে পারেন না? সরকার প্রধান হিশেবে প্রধানমন্ত্রী যেখানে মুরাদ হাসানকে মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করতে বলেছেন, সেখানে কি সংসদের নারী সদস্যরা এই বার্তা পান না যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী ভালভাবে নেন নাই? সংসদে সদস্যপদ নিয়ে হাইকোর্ট বলেছে এটা স্পীকারের এক্তিয়ার। স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরি একজন নারী, তিনি আইনে পড়াশোনা করেছেন। কাজেই এখানে তাঁরও তো দায়িত্ব রয়েছে একটা এমন সিদ্ধান্ত দেয়ার যা এই জাতীয় সংসদের মর্যাদা বাড়াবে।

তাঁর অবস্থান প্রমাণ করবে যে এই জাতীয় সংসদে অন্তত নারী বিরোধীদের স্থান হবে না।

আমরা অনেকেই সমাজে নারী স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করি এবং জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবার জন্যে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের কাছে যাই। বিভিন্ন সভায় তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই এবং তথ্য উপাত্ত দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে অন্তত অন্যান্য সাংসদদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। এই ব্যাপারে আমরা সফলও হয়েছি এবং অনেক নারী সংসদ সদস্যের কাছ থেকে আন্তরিক ও ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছি। সাধারণ আসনে যেসব নারী নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে জবাবদিহিতা আছে। তারা শুধু নারী নয় সকল মানুষের পক্ষে কথা বলবেন, এটাই প্রত্যাশা থাকে। তাই বলে তাঁরা নারী হয়ে নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে কথা বলবেন না এটাই বা কেমন কথা? তাদের দায়ও তো কম নয়। সংরক্ষিত নারী আসনের তো কোন নির্বাচনী এলাকা নাই। তাঁরা নিজ এলাকার জন্যে কাজ করতে চাইলেও তাঁদের প্রধান জবাবদিহিতা তো এই নারী সমাজের কাছেই। তাঁরা নারী বলেই এই আসনগুলোতে বসেছেন শুধু নিজেদের জন্যে নয়, দেশের নারীদের অধিকার রক্ষার জন্যে। নারীর অমর্যাদা হলে তাঁদের কি মর্যাদা বজায় থাকে? সংসদেরই কোন পুরুষ সদস্য দ্বারা নারীর অবমাননা হলে, যা স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী আমলে নিয়েছেন, তাঁদের কি কিছুই করণীয় নাই? এর জন্যে কি নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে তদবীর করতে হবে?

নারী সংসদ সদস্যদের "নীরবতা" এই অবমাননায় আরো খারাপ মাত্রা যোগ করবে।

আমরা আশা করবো এই নীরবতা নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে।

অধ্যায় চার

নারী আসন ও মামলা

সংসদে নারী আসন বিল ও নারী সংগঠনের মামলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫ (৩) ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে সাধারণ আসনে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি নারীদের জন্যে কিছু আসন সংরক্ষণ বা হবে, তবে এর নির্বাচন পদ্ধতি হবে পরোক্ষ, অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরাই তাদের নির্বাচন করবেন। প্রথমে দশটি আসন মাত্র দশ চছরের জন্যে থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনীতে আসন সংরক্ষণের মেয়াদ এবং এবং আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়। শেষ পর্যন্ত সপ্তম সংসদ (১৯৯৬ – ২০০১) পর্যন্ত আসন সংখ্যা ছিল ৩০ টি। কিন্তু সে সময় মেয়াদ ও আসন বাড়ানোর বিল আনা হলেও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দুই তৃতীয়াংশ আসন না থাকায় সংবিধানের এই ধারাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ অষ্টম সংসদে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সংবিধানে নাই, এবং সেই কারণে অষ্টম সংসদে জাতীয় স্সংদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত মাত্র ৫ জন নারী ছাড়া আর কোনো নারী ছিলেন না। ফলে সংরক্ষিত আসনে নতুন করে বিল আনা হয়েছিল।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনের আগে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী খুব জোরদার হলে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়েই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সরাসির নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। অষ্টম সংসদে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামসহ চার দল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে। কিন্তু তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। বিএনপি নেতৃতাধীন জোট সরকাররে আইন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ আসন সংখ্যা ৪৫ এবং পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে সংসদে নির্বাচিত দলের মধ্যে ভাগাভাগির ভিত্তিতে বিল উত্থাপন করেন। এতে নারী সংগঠনগুলো আপত্তি জানায়। এবং জাতীয় সংসদে ৪৫ মহিলা আসন সংরক্ষণে

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে সম্মলিতি নারী সমাজসহ ৮টি নারী সংগঠন হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে। নারী নেত্রীদের দায়েরকৃত রিট মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২২ জুন, ২০০৪ সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করেছে। সেই সঙ্গে জাতীয় সংসদের ৪৫ সংরক্ষিত আসন সংশ্লিষ্ট সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব,স্পীকার ও নির্বাচন কমিশনকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। বিচারপতি এম এ মতিন ও বিচারপতি তারিক-উল-হাকিম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ প্রদান করে। এরপর একই বিষয়ে নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়।

বিচারপতি এম এ মতিন ও বিচারপতি তারিখ-উল-হাকিম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ প্রদান করে। রিটকারীর পক্ষে শুনানিতে ড. এম জহির বলেন, ১৭ মে, ২০০৪ তারিখে জাতীয় সংসদের ৪৫ আসন সংরক্ষণ করে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীতে ৪৫ মহিলা আসন সংসদ সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান সংবিধান পরিপন্থী। কারণ ৩০০ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪৫ মহিলা আসন কিভাবে বন্টন হবে তার কোন হিসাব-নিকাশ এই সংশোধনীতে নাই। মহিলা আসন বন্টনের জন্য যত ভাল আইন করা হোক না কেন সঠিক বন্টন করা যাবে না। ড. এম জহির বলেন, বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংরক্ষিত মহিলা আসন সরাসরি ভোটের মধ্যেম নির্বাচনের কথা বলা হলেও তা ভঙ্গ করে তারা জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের অসম্মান করেছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী কোন মহিলা রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলে এই পদ্ধতিতে মহিলা আসনের সংসদ সদস্য হতে পারবেন না। তাই ৪৫ মহিলা আসন সংরক্ষণ করে আনীত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী সংবিধানের মূল কাঠামো গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার পরিপন্থী। সরকাররে পক্ষে অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল ফিদা এম কামাল বলেন, চতুর্দশ সংশোধনী অনুযায়ী মহিলা আসন বন্টনের জন্য এখনও আইন করা হয়নি। তাই রিটটি এ পর্যায়ে অপরিণত। সংবিধান সংশোধনীর বিচারক বিবেচনা হয় না। রিটকারীদের এ রিট দায়েরের কোন আইনগত অধিকার নাই

কিন্তু নারী সমাজের দাবিকে পাশ কাটিয়ে ও উপেক্ষা করে সরকার জাতীয় সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষণরে বিধান সংবলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিলটি পাস হয় ১৫ মে, ২০০৫। এটি দেশের নারী সমাজের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধনী। কেননা,এই সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদে নারী আসনের বিধান করা হলো। বিলটি পাস হওয়ার পরও সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থকেছে। সরকার নারীদের জন্য ইতিবাচক নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও নারী সমাজের এই দাবীকে উপেক্ষা করেই সংসদে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর আসন অনুপাতে তা বন্টনের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয়। অথচ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যেও ছিল। কিন্তু সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে জনসমর্থনহীন এই দাবিটি সংসদে পাশ করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিরুদ্ধে গোটা নারী সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলো সোচ্চার হয়ে উঠলেও সরকার একপেশে মনোভাব পোষণ করেন। নারী সংগঠনগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে রাজপথে নেমে আসে। বিভিন্ন সভ-সমাবেশ নারী নেত্রীরা এর প্রতিবাদ জানান।

সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন না দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, নারী আসন নিয়ে যেসব কথাবর্তা হচ্ছে তার বেশিরভাগই কল্পনা ও আবেগপ্রসুত। এ বিষয়ে আরো চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নের স্বার্থেই সংসদে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আসন ৩০ থেকে ৪৫ টিতে উন্নীত করতে চায়। তিনি বলেন, উপমহাদেশের কোথাও সংরক্ষিত আসনে সরসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই। আমাদের সংসদে মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে কীভাবে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নারী সংগঠনগুলো সে ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে পারেননি। আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্যও নারী সমাজে তীব্র, প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নারী নেত্রী রা বলছেন, অন্য কথা। তারা বলেন আইনমন্ত্রীর সামনে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সরাসরি নির্বচন দেয়ার কথা বলাও হয়েছিল। সরকার যদি সরাসরি নির্বাচন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিত তাহলে একটি সুসমন্বিত প্রক্রিয়া বের করা মোটও কোন কঠিন কাজ ছিল না। এদিতে সরাসরি নির্বানের

দাবীটি উপেক্ষিত হওয়ার সরাসরি নির্বাচন দাবীকারী নারী সংগঠনগুলো ক্ষুব্ধ। রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সমঅধিকারের কথা বলা হলেও সংরক্ষিত আসনের এই ব্যবস্থা সচেতন নারী সমাজের অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে এর কার্যকারিতা। ইতিপুর্বে যে সব নারী সংসদে গিয়েছেন, তারা শুধু শোভাবর্ধন ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি। সংসদের নারী আসন যেন শুধুমাত্র সেট সেট অলংকার। সরাসরি নির্বাচন শুধু নারী সমাজেরই দাবী নয়, দেশের সাধারণ মানুষেরও দাবী। আর এই দাবী না মানার অর্থ দেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। যখনই সরকারের মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা হয়েছে তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষরাই এগিয়ে এসেছে। সতরাং একে উপেক্ষা করা অবমাননাকর।

সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিষয়টি নতুন কোন ঘটনা নয়। এ বিশেষ ব্যবস্থাটি পাকিস্তান আমলেও ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও সপ্তম সংসদ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পাকিস্তান আমলে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ছিল ৭। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে তা ১৫ তে উন্নীত করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পঞ্চম জাতীয় সংসদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মহিলাদের অধিকতার অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৫-৩০ এ উন্নীত করা হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনৈতিক, অথনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মহিলা সমাজের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞ সংবিধান প্রণেতারা বাহাত্তর সালেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধানটি রেখেছিলেন। সংবিধানের চর্তুদশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত মহিলা আসন করা হয়েছে ৪৫টি। এসব আসনে সংসদের বিভিন্ন দলের এমপিদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুযায়ী মহিলা সদস্য মনোনয়ন দেয়া হবে। চলতি সংসদের পরও আগামী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য এ অবস্থা চালু থাকবে। সংবিধানের বিধান তথা অনুপাতিক হারে ৬ জন করে সংসদ সদস্যের অনুপাতে ১ টি করে সংরক্ষিত আসন পড়েছে। অর্থাৎ যে দলের ৬টির বেশী আসন রয়েছে তারাই পাবে ১টি আসন। এছাড়াও সমঝোতার মাধ্যমে মহিলা আসন ভাগ হতে পারে। সেই অনুপাতে বিএনপি পাবে ৩০ টি আসন। অর্থাৎ শরিক দল মিলে বিএনপি পাবে সংরক্ষিত

মহিলা এমপির ৩৩ আসন। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি পাবে ২টি আসন। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ পাবে ৯টি আসন।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারী আসনের সরাসরি নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। নারীর প্রকৃত সমস্যাগুলো নারীরাই উপলব্ধি করতে পারে। তাই অন্তত ১০০টি আসনে নারীর সরাসরি নির্বাচিত হলে শতকরা নব্বইই ভাগ নারীই দেখা যাবে সাধারণ নারীদের নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু মন্ত্রিসভাব সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তে দুই দশকের নারী আন্দোলনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ত্রিশটির অধিক নারী সংগঠন এবং আর্ন্তজাতিক নারী সম্মেলন বেইজিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ২০০ থেকে ২৫০ সংগঠন এদের সকলের একই দাবী সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন দাবী করেন এবং সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা কীভাবে ভাগ করা যাবে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও আলোচনারই মূল্যায়ন করেনি সরকার, বরং বর্তমান মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবিত বিলটিত নারী সদস্যদের জবাবদিহিতার কোনও ব্যবস্থা নাই। সংসদে নারী সদস্যদের অলংকার হিসেবেই দেখা যাবে। সরকার দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রিসভায় এই গৃহীত প্রস্তাবে নারী কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। নারী রাজনীতিতেও পণ্য হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত বিলটিতে নারীর কোনও সাংবিধানিক এলাকাও তৈরি হবে না। সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে এসে যে বিল পাশ করতে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে নারী সংগঠনগুলো আগেও রাজপথে ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে।

মামলা: সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন

নারী সংগঠনের রিট আবেদন: সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এর আগে কয়েকটি সংগঠনের পক্ষে দায়ের করা ওই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে চর্তুদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সৃষ্ট সংরক্ষিত ৪৫ টি নারী আসন কেন বাতিল করা হবে না এই মর্মে হাইর্কোট একটি রুল জারি করেছিল। এই মামলার নিস্পত্তি না হওয়া সত্তেও সরকার এই সংক্রান্ত নির্বাচন পদ্ধতি আইনটি পাস করে হাইকোর্টের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। আবেদনে আরো বলা হয়, চর্তুদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে ৪৫টি নারী আসনের সৃষ্টি করা

হয়েছে তা সংবিধানের ৬৫টি অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। এ আইনে বলা হয়েছে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একজন নারী প্রতিনিধি থাকবেন, কিন্তু চর্তুদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সৃষ্ট ৪৫ টি নারী আসনের জন্য কোন আসন নির্দিষ্ট করা হয়নি। আইনটি পাসের মাধ্যমে আসন বন্টনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক হারের এক হাস্যকর হিসাব দেয়া হয়েছে। এই আইনে জনপ্রতিনিধিত্বের বিধান মানা হয়নি। বৈষম্য করা হয়েছে সাধারণ নারীদের যারা যারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন তাদের। কারণ এই আইনে ৪৫টি নারী আসন কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বন্টনের কথা বলা হয়েছে।

আইন পাস: ২০০৪ সালের ১৭ মে জাতীয় সংসদে সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনী আইন পাস হয়। এই সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫ টি সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়। এ আসনগুলো জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে এমপিদের ভোটে নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ উপধারা সংশোধনীতে বলা হয়, সংবিধানের(চতুর্দশ সংশোধনী) আইন-২০০৪ প্রবর্তন কালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া ১০ বছরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকাল সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পযর্ন্ত ৪৫ আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। এ বিধানের আলোকে পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিধান করে গত বছরের (২০০৪) ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস করা হয়। ৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এ আইনে স্বাক্ষরের পর গেজেট প্রকাশিত হয়। পরে ৪৫ দিনের জায়গায় ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের বিধান করে এ আইনের সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপতি ২১ ডিসেম্বর অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশটি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন সংশোধন আইন-২০০৫ নামে পাস হয়।

কোন দল কতটি আসন পায়: বিএনপি-২৯টি, বিরোধীদল-৯টি, জামায়েত ইসলামী-৩টি, জাতীয় পার্টি-২টি, অন্যান্য ক্ষুদ্র দল ও স্বতন্ত্র সদস্যরা-২টি আসন।

হাইকোর্টের রায়: ২০০৪ সালের ৩০মে হাইর্কোটের একটি দ্বৈত বেঞ্চ ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান সংক্রান্ত সংবিধানের চর্তুদশ সংশোধনী সংবিধান পরিপন্থী নয় বলে রায় দেন।

হাইর্কোটের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের মামলা: জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংক্রান্ত মামলায় হাইর্কোটের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম র্কোটে মামলা দায়ের করা হয় ৬ জুন ২০০৫ তারিখে চেম্বার জজ বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিনের আদালতে। আদালত ১১জুন ২০০৫ আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করে। তবে আদালত কোন আদেশ না দিলেও নির্বাচন কমিশন আপাতত নারী আসনের নির্বাচনী তফসিলি ঘোষণা করছে না।

সংরক্ষিত আসনের সরাসরি নির্বাচন মামলার রায়

শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ভাগ্য পুরুষদের হাতেই রেখে দেয়া হয়েছে। অবকাশকালীন মেয়াদে হাইকোর্টে জাতীয় সংসদে ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর অংশবিশেষ এবং এসব আসনে নির্বাচনের জন্য প্রণীত আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা তিনটি রিট মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই রাযের মাধ্যমে এই আইনের আওতায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের প্রহসন বা 'মনোনয়ন' বৈধ হয়ে গেলো। এবং বিএনপি, জোটভুক্ত সংগঠন, স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এখন যার যার ভাগে প্রাপ্ত আসনগুলোতে মহিলাদের ভাগবাটোয়ারা পদ্ধতিতে সংসদে নিয়ে বসাতে পারবেন। এতে আর কোন বাধা রইলো না। খুবই খুশির কথা।

যেদিন হাইকোর্টে রায় দেয়া হবে সেদিন মামলার বাদী হিসেবে আমরা যারাই খবর পেয়েছি হাইকোর্টে ছুটে গিয়েছি। আমাদের কারোরই ধারণা ছিল না এই ছুটির অবকাশে এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ঘোষণা হবে। অনেকেই জানেনও না, বাদীদের কেউ কেউ ঢাকা শহরেও ছিলেন না। কোর্ট একবারে ফাঁকা। অন্য সময়ের গম গম পরিবেশ সেদিন কোর্টে দেখা যায় নি। কিন্তু অবাক হলাম এটা দেখে যে ক্ষমতাসীন বিএনপির বেশ কিছু মহিলা আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেত্রী যাঁরা সংরক্ষিত সম্ভাব্য প্রার্থী, তাঁদের বেশ কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের অনেককেই কোর্টে

মামলার শুনানীর সময় দেখা যায় নি। বিগত তিন মাস ধরে মামলার শুনানী হচ্ছে এবং বাদী পক্ষের আইনজীবীরা অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে সংবিধানের এই সংশোধনী এবং তার সাথে যে আইনটি করা হয়েছে তা নানাভাবে নারীদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে। এবং সংরক্ষিত আসনের অপব্যবহার করার ক্ষমতা রাজনৈতিক দলগুলোর আগে তো ছিলই এখন তা আরো বৈষম্যমূলক করা হোক। কোন নারী সংসদে আসন পায় এমন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না থাকলে তার সংরক্ষিত আসনে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাঁরা পরিস্কারভাবে বলেছেন যদি সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষণ করা হয় তা নারীদের স্বার্থেই ব্যবহার করতে হবে। কেবল রাজনৈতিক দলের নারীদের জন্যে তা উন্মুক্ত রাখলে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা কখনোই হবে না। আর তা ছাড়া এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো সহজেই নারী আসনে তাদের নারী কর্মীদের বসাতে পারলে সাধারণ আসনে কখনোই মনোনয়ন দানের কথা ভাববে না। এভাবে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেও সংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারবেন না। এই যুক্তিগুলোর পক্ষে নারী সংগঠনের কর্মীদের চেয়েও বেশী রাজনৈতিক দলের নারী সদস্যদের প্রতি দলগুলোর অন্যায়, অবিচার বন্ধ করার জন্যে বলা হয়েছে। কিন্তু সেদিন দেখলাম অন্য একটি চিত্র।

সংসদে নারী আসন নাকি বিএনপির নারী নেত্রীদের স্পোর্টস !!

নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন। সে সময় হাইকোর্টে অবকাশকালীন ছুটি চলছিল। জাতীয় সংসদে ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ব্যবস্থা সংবলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর অংশবিশেষ এবং এসব আসনে নির্বাচনের জন্য প্রণীত আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা তিনটি রিট মামলা হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই রায়ের মাধ্যমে এই আইনের আওতায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের প্রহসন বা মনোনয়ন বৈধ হয়ে গেলো। বিএনপি, জোটভুক্ত সংগঠন, স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এখন যার যার ভাগে প্রাপ্ত আসনগুলোতে মহিলাদের ভাগবাটোয়ারা পদ্ধতিতে সংসদে নিয়ে বসাতে পারবেন। এতে আর কোন বাধা রইলো না। খুবই খুশির কথা। লাফালাফি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। যাকে বলে স্পোর্টস।

যেদিন হাইকোর্টে রায় দেয়া হয়েছে, (৩০ মে, ২০০৫) সেদিন মামলার বাদী হিসেবে আমরা যারাই খবর পেয়েছি হাইকোর্টে ছুটে গিয়েছি। আমাদের কারোরই ধারণা ছিল না এই ছুটির অবকাশে এমন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ঘোষণা হবে। অনেকেই জানেনও না, বাদীদের কেউ কেউ ঢাকা শহরেও ছিলেন না। এমনিতেই কোর্ট একেবারে ফাঁকা। অন্য সময়ের গম গম পরিবেশ সেদিন কোর্টে দেখা যায় নি। কিন্তু অবাক হলাম এটা দেখে যে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির বেশ কিছু মহিলা আইনজীবী এবং রাজনৈতিক নেত্রী যাঁরা সংরক্ষিত আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী, তাঁদের বেশ কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা সকাল থেকেই হাসছেন। বেশ খুশি তাঁরা। অথচ তাঁদের অনেককেই এতোদিন কোর্টে মামলার শুনানীর সময় দেখা যায় নি। বিগত তিন মাস ধরে মামলার শুনানী হচ্ছে এবং বাদী পক্ষের আইনজীবীরা অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যে সংবিধানের এই সংশোধনী এবং তার সাথে যে আইনটি করা হয়েছে তা নানাভাবে নারীদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে। এটা নারীদের জন্যে অবমাননাকরা। সংবিধানের অন্য ধারার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং সংরক্ষিত আসনের অপব্যবহার করার ক্ষমতা রাজনৈতেক দলগুলোর আগে তো ছিলই এখন তা আরো বেশি পোক্ত করা হোল। শুধু পার্থক্য হোল এই যে আগে শুধু সংখ্যাগরিষ্ট দলটি ভোগ করত এখন তারা একটু দয়া করে কিছু ভাগ অন্যদের দিয়েছেন। আইন মন্ত্রী এই কথা বলে বেশ গণতন্ত্রমণা বরে গর্ব করেন। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের যাবার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। সংসদে যেতে হলে তাদের রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হতে হবে, নইলে তাদের স্ত্রী কিংবা বোন বা আত্মীয়-বন্ধু হতে হবে। নইলে মৃত বিএনপি নেতার স্ত্রী হলেও কিছুটা চান্স থাকবে। শুধু রাজনৈতিক দল হলেই চলবে না, জাতীয় সংসদে আসন পাবার মতো দল হতে হবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আমরা আগামিতেও কাদের এই আসনগুলোতে দেখবো !

শুনানীতে বাদী পক্ষের আইনজীবীরা পরিস্কারভাবে বলেছেন যদি সংসদে নারীদের জন্যে আসন সংরক্ষণ করা হয় তা নারীদের স্বার্থেই ব্যবহার করতে হবে। কেবল রাজনৈতিক দলের নারীদের জন্যে তা উন্মুক্ত রাখলে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়াগায় কখনোই হবে না। সবচেয়ে বড় কথা যারা রাজনীতি করেন, সে যে দলেরই হোক, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনে নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সবচেয়ে বড় সুযোগ তা আর নারী কর্মীদের

থাকছে না। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলো সহজেই নারী আসনে তাদের নারী কর্মীদের বসাতে পাররে সাধারণ আসনে কখনোই মনোনয়ন দানের কথা ভাববে না। কি দরকার অতো কষ্ট করে? ব্যারিস্টার মওদুদের মতো ব্যক্তিরা নারীরা কি পারবে না পারবে সিদ্ধান্ত দেন। কি দরকার অতো কষ্ট করে? ব্যারিস্টার মওদুদের মতো ব্যক্তিরা নারীরা কি পারবে না পারবে সিদ্ধান্ত দেন। আমি আগেও লিখেছি এখনো বলছি। ব্যারিস্টার মওদুদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন নারীরা কখনোই নির্বাচন করতে পারবেন না, কারণ তাঁর ফর্মূলা অনুযায়ী নারীদের মাস্তান শক্তি (মাসল পাওয়ার)এবং পাঁচ কোটি টাকা নাই। আমাদের দেশের আইনমন্ত্রী এইভাবে কথা বলেন!! খোলামেলাভাবে। সভা সেমিনারে। কি সাংঘাতিক নির্বাচনী নীতি বিরোধী কথা! নারীদের ব্যাপারে তাঁর রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের কারণে এমন একটি উদ্ভট আইন হয়েছে।

মামলা করা হয়েছিল অনেক সুদুরপ্রসারী কথা ভেবেই। তাই আইনী লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। নারীরা এখন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। তাঁদের কাজ, তাঁদের কথাবার্তায় যে আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে সেটা আসে জনগণের ভোট পাবার কারণেই। সেদিন দেখলাম আমাদের এলাকায় রাস্তাটি ঠিক করার উদ্যোগ নিয়েছেন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার। খুবই খারাপ রাস্তা হওয়ার কারণে এলাকাবাসীর সমস্যার কথা শুনে তিনি এই উদ্যোগ নিলেন। কথাটি শুনে খুব ভাল লাগলো। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার নজির এটা। এমনি অনেক উদাহরণ গ্রামে গঞ্জে মিউনিসিপালিটিতে আছে।

কিন্তু জাতীয় সংসদে যারা যাবেন বলে পার্টি নেতাদের বাড়ীতে ধর্ণা দিচ্ছেন, তাঁদের আচরণ কেমন হবে তার কিছু নমুনা সেদিন হাইকোর্টেই পেলাম। সকাল থেকেই জাতীয় পার্টির মহিলাদের মধ্যে খুশি খুশি ভাব। দু'একজন একটু টেনশনে ছিলেন মনে হয়, কিন্তু তাঁদের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁর চেহারা পরিস্কার এবং তিনি সমানে হাসছেন। দুপুরের ঘন্টা খানেক বিরতির সময় তাঁদের মারমুখী আচরণ আমাদের বিস্মিত করেছে। একজন আমাদের বলেই বসলেন, 'আপনারা যারা আমাদে এতোদিন দেরী করিয়ে দিলেন, তাঁদের জনে জনের বিরুদ্ধে মামলা করবো!!" দেরী করিয়ে দিলেন? সত্যিই তো, আইন পাশ হবার পর মামলা না হলে তো এতোদিন তাঁদের পাজেরোতে চড়ার কথা। বললাম, মামলা করলে তো আইন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আগে করতে হবে। তিনি তো আইন তুলেছেন অনেক দেরীতে। দুই বছর

তো তিনিই নষ্ট করেছেন!! কে শোনে কার কথা। তবুও বললাম, আমরা চাই আপনারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসুন। আমরা আপনাদের সম্মান করবো। উত্তরে বললেন, আমরা সংসদ সদস্যদ্বারা নির্বাচিত হবো, এটা আরো বেশী মর্যাদার। হায় রে। জনগণ বেশী বড়, না সাংসদ বড় সে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। রায় হবার আগেই এমন অগণতান্ত্রিক বাক্যালাপ শুরু হয়ে গেছে। সেদিন কোর্টে এমন একটি পরিবেশ ছিল মনে হচ্ছিল চরে বুঝি জমি দখলের মামলা হয়েছে। এখন কে জিতে জমিটা হাতড়িয়ে নেবে তারই রায় হবে।

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী এখন মনোনয়ন হতে পারবে! আমরা যারা মামরা করেছিলাম এটা আমাদের আন্দোলনের অংশ ছিল, তাই থাকবে। যতোদিন এবং যতোভাবে আইনী লড়াই করা যায আমরা করবো। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয় নি যে আমাদের দাবী অযৌক্তিক। আদালত এর আগে সংবিধানের দশম সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ড.আহমদ হোসেনের দায়েরকৃত মামলার আপিল বিভাগের রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন,আপিল বিভাগ তাদের রায়ে সংবিধানের দশম সংশোধনী ও এর নির্বাচনকে বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। তাই এই আদালত আপিল বিভাগের রায়ের বিপক্ষে কোন মন্তব্য করতে পারেন না। তাই তাঁরা এই রিট পিটিশন খারিজ করে দিয়েছেন। কাজেই আপিল বিভাগের পূর্বের রায়ের ব্যাপারে আইনী ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা তাই আরো আইনী লড়াই চালিয়ে যাব কারণ এভাবে দীর্ঘদিন সংবিধানে নারী-বিরোধী একটি ধারাকে টিকিয়ে রাখা নিশ্চয় ঠিক হবে না। সংবিধান প্রণেতারা কি এগিয়ে আসবেন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্যে?

বর্তমান সংসদ আর মাত্র সাত মাস বাকি। রায়ের সার্টিফাই কপি পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। যদি সত্যি সত্যি বর্তমান সংসদ মহিলা আসনে মনোনয়ন দেয় তাহলেও তারা ৫ মাস ছয় মাসের বেশি পাবেন না। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে সাংসদ হবার লোভ বিএনপির নারী নেত্রীরা সামলাতে পারছেন না। এ্যাডভোকেট এলিনা খান এমন সংক্ষিপ্ত সময়ের সাংসদদের নাম দিয়েছেন ‘মরহুম সাংসদ’। বিএসপি এর আগেও একবার এভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে নারীদের সাংসদ বানিয়েছিল। এবার এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমরা কাদের সেখানে পাচ্ছি? সে চিত্র একটু দেখা যাক্। কোর্টে অবশ্য কয়েকজনকে দেখলাম। একজনতো চ্যানেল আইতে বলেই বসলেন, সরাসরি নির্বাচনে আমরা বিশ্বাস করি না! অর্থাৎ

এরা হবেন নারী আন্দোলন বিরোধী গোষ্টি যারা নারীদের একটি গণতান্ত্রিক দাবীকে নস্যাৎ করার জন্যে জাতীয় সংসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসন গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে পত্রিকায় কিছু খবরও প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। পাজেরো গাড়ীতে চড়ার জন্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে সক্রিয় হতে শুরু করেছেন অনেকে (প্রথম আলো ৪ জুন, ২০০৫)। বর্তমানে তাদের নিজস্ব যে গাড়ী আছে তাই নিয়ে ছুটছেন বিএনপির সিনিয়র মন্ত্রী ও নেতাদের বাড়ীতে। যদিও বিএনপির সিনিয়র নেতারা ত্যাগী নেত্রী, পরীক্ষিত নেত্রীদের কথা বলছেন, কিন্তু বিএনপির ভাগে পাওয়া ৩০টি আসনে নেতাদের স্ত্রী, সাবেক সাংসদ, যারা সাধারণ আসনের নির্বাচনে পাশ করেন নি, কিন্তু মন্ত্রী হয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় নেত্রীদের আসন দেয়ার পর সত্যিকারের কয়জন ত্যাগী নারী কর্মীদের আসন দেয়া হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। যারা দলের জন্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তারা মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়ছেন, যে তাঁদের নাম নেতাদের যেন মনে থাকে। এটা নিশ্চয় খুব দুঃখজনক হবে যে যারা ধর্ণা দেয়ার ওস্তাদ তারা সহজেই পেয়ে যাবে আর যারা সত্যিকারের কাজ করবেন তাদের এখন নার্ভাস হয়ে বসে থাকতে হবে। কি জ্বালা! আমরা এই কথাই বলেছি যে নারী রাজনৈতিক কর্মীরাও এই পদ্ধতিতে তাঁদের যোগ্য সম্মান পাবেন না। আমার অবাক লাগে যে তবুও তাঁরা নিজেরাও কেন এই পদ্ধতি চান? আত্মসম্মান থাকলে কেউ এই করুণা চাইতে পারে না। মজার ব্যাপার হোল যারা এখন নারী আসনের সাংসদ হতে চাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের বায়োডাটায় দেখাচ্ছেন না যে তাঁরা নারী অধিকারের প্রশ্নে কত সোচ্ছার, বরং বলছেন দলের জন্যে তাঁরা কত খেটেছেন। পত্রিকার মিছিলের ছবিগুলো নিশ্চয় আছে। তাইতো বলবেন, আর কিইবা বলার আছে। জনগণ তো ভোট দিচ্ছে না যে অতো বড় বড় বুলি ছাড়তে হবে!

আওয়ামী লীগ তার ভাগের আসন নেবে বলে অনেক নাম আমরা আগে শুনেছি। কিন্তু এখন তারা নাকি আগ্রহী নয়। শুনে ভাল লাগলো। যদি কোন কারণে তাঁরা নিয়েই বসেন তাহলে বুঝবো সব রসুনের গোঁড়া এক জায়গাতেই আছে। অবাক হবো না।

রায়ের একটি মন্তব্য সব পত্রিকায় লেখা না হলেও দু'একটি পত্রিকায়, বিশেষ করে, নিউএইজ এবং ডেইলি স্টারে তুলে ধরা হয়েছে। বাদীদের পিটিশনে এই কথাটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিএনপি নির্বাচনের আগে অঙ্গীকার করেছিল যে তারা সংখ্যাগরিষ্টতা পেলে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি

নির্বাচনের বিল আনবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজের মুখে বলেছেন, বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতায় বলেছেন, নারী আন্দোলনের নেত্রীদের কাছে বলেছেন, এমনকি খোদ আইনমন্ত্রী বলেছেন। প্রথম দিকে তিনি এমনও বলেছেন আপনাদের এই আন্দোলন আমার কাজে সহায়তা করবে। কিন্তু বিএনপির সবাই মিলে তার নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আদারত পরিস্কারভাবে বলেছেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর তাঁদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পুরণে সংসদে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা উচিত এবং সংসদের কাছে নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে দায়বদ্ধ থাকা উচিত'। যদিও কোর্ট রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে কি আইন আনবে না আনবে তা নিয়ে হস্তক্ষেপ করবে না তবে এই প্রস্তাব বিজ্ঞ বিচারকরা রেখেছেন।' ওয়াদা ভঙ্গকারীদের আল্লাও মাফ করবেন না। তাদের স্থান হাবিয়া দোযখ।

সংরক্ষিত আসন বিল: ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর

গ্রামে একটি কথা আছে, 'ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর'। আমাদের জাতীয় সংসদে এখন সেই দশা হয়েছে। সপ্তম সংসদের মেয়াদেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ শেষ হবে এটা এই সংসদ শুরু থেকেই সবার জানা। সংবিধান অনুযায়ী তাই হবার কথা। কিন্তু আমাদে সংসদে সরকারি দল, আওয়ামী লীগ এবং প্রধান বিরোধী দল, বিএনপি এই আসনগুলোর প্রতি গত পাঁচ বছর চরম এবং অমার্জনীয় অবহেলা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন- যা নারী সমাজ কখনোই ক্ষমা করবে না। তারা পরস্পরের মধ্যে ঠেলাঠেলি করেছেন কিন্তু এই আসনগুলোকে রক্ষা করার জন্যে যা করা দরকার ছিলো তা তাঁরা করেন নি। এদিকে সপ্তম সংসদ যখন শেষ হবার সময় হলো তখন শুরু হলো অন্য নাটক।

গত ৯ জুলাই সরকারি দল সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিল উপস্থাপন করেছে। তারা ৬ জুলাই স্পীকারের মাধ্যমে বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন একদিনের জন্যে হলেও সংসদে আসার জন্যে এবং বিলটি পাস করার জন্যে। সেই সময় আইনমন্ত্রী খুব উদারভাবে বলেছেন যে, বিরোধী দল সংসদে আসলে সবাই মিলে বিলটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন যা করতে হয় তাই করবেন। আসন সংখ্যা বাড়ানো এমনকি সরাসরি নির্বাচনের প্রথাও রাখা যেতে পারে। বিরোধী দলও তৎক্ষণাৎ এই আহবান নাকচ করে বলেছে এই আহবান ভাওতাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। কথাটি

মিথ্যে নয়। এই শেষ মুহূর্তে এইভাবে আহবান জানানোর মধ্যে ধোঁকাবাজি অবশ্যই রয়েছে। বিরোধী দল সরকারি দলের টোপ গেলে নি। স্পীকার কি জানতেন না যে, বিরোধী দল এই সময় আর সংসদে আসবে না? তা হলে এই আহবান জানিয়ে তিনিই বা কি করতে চেয়েছেন ?

সরকারি দল আওয়ামী লীগ এবং বিশেষ করে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু সাহেব বার বার ভুলে যাচ্ছেন যে, বিরোধী দলের বাইরেও এই আসনগুলোর ব্যাপারে আরো একটি শক্তি সংসদের বাইরে রয়েছে- যাদের কাছে তাঁর নিজের জবাবদিহিতা রয়েছে। নারী সংগঠনগুলো এতদিন যে আন্দোলন করে এসেছে তার প্রতি তিনি কোনো প্রকার সাড়া দিচ্ছে না এবং মনে করেছেন যে তিনি এভাবে পার পেয়ে যেতে পারবেন। সকল নারী সংগঠনের একটি কথা তাকে শুনতেই হবে। সেটা হচ্ছে এই আসনগুলোর আর মনোনয়নের মাধ্যমে নয়, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে হবে। কাজেই তার আনীত বিলে সরাসরি নির্বাচনের বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আইনমন্ত্রী কানে এমনই তুলো দিয়েছেন যে, এই কথাগুলো তিনি কিছুতেই শুনছেন না। গত ৬ তারিখে স্পীকারের আহবানের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নারী সংগঠনগুলো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সম্মিলিত নারী সমাজ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সকলেই বলেছেন, সরাসরি নির্বাচনের বিধান আনার জন্যে। মনে হয় আইনমন্ত্রী পত্রিকা পড়েন না।

গত ৯ জুলাই তারিখের সংসদ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপিত হয়েছে আগের মতোই এবং সঙ্গতভাবেই দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিতির অভাবে বিলটি পাস হয় নি। সরকারি দল সংসদে খুব হইচই করেছে এবং বিএনপিকে দোষারোপ করেছে যে, তারা না আসার কারণেই বিলটি পাস হয় নি। এটা সত্যি। বিএনপি না আসার কারণে বিলটি পাস হয় নি। তবুও আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু হাল ছেড়ে দিতে নারাজ। তিনি ডেপুটি স্পীকারকে অনুরোধ করেছেন, সংসদের শেষ দিন পর্যন্ত বিরটি রেখে দিতে এবং বিরোধী দলকে পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও সংসদে আসার জন্যে অনুরোধ করেছেন। বাহ খুব সুন্দর কথা।

আওয়ামী লীগের সাংসদদের ভাগ্য ভালো যে, বিরোধী দল আসে নি। আসলে তো সরকারি দলের সদস্যদের অনুপস্থিতিই এ বিল পাস না হবার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। বিএনপি বা বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত হন নি

কারণ তারা সংসদ বর্জনরত অবস্থায় আছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাংসদরা কেনো উপস্থিত থাকেন না? তারা কার সঙ্গে রাগ করে আছেন? সংসদে প্রায়ই সাংসদদের অনুপস্থিতির কারণে কোরাম হয় না। এ অবস্থায় কি করে আমরা আশা করতে পারি যে, সংরক্ষিত আসনের বির সঠিকভাবে আলোচনা হয়ে পাস হতো?

এখন আইনমন্ত্রীর বিল এমনই সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে আছে যে, বিরোধী দল এসে মাত্র পাঁচ মিনিটেই পাস করে দিতে পারবে। টেলিভিশনে দেখলাম আইনমন্ত্রী বিলটির ব্যাপারে এতোই উত্তেজিত যে, বাংলায় কথা বলতেই ভুলে গেছেন। তিনি ডেপুটি স্পীকারকে ইংরেজিতে অনুরোধ করেছেন বিলটি সম্পর্কে।

আইনমন্ত্রীর আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না যে তিনি নারী আন্দোলনের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি যদি শ্রদ্ধাশীল হতেন হাহলে অন্তত তার দিক থেকে বিরটিতে সরাসরি নির্বাচনের বিধান যোগ করে দিতেন। বিরোধী দল আসুক বা না আসুক, তিনি অন্তত নিজের দিকটা পরিস্কার রাখতেন। এরপর বিরোধী দল না এলে তার দায় বিরোধী দলকেই নিতে হতো। আমরা সকলে মিলেই তাদের দোষারোপ করতাম কিংবা চাপ সৃষ্টি করতাম যেনো তারা ৫ মিনিটের (!) জন্যে হলেও এসে বিলটিতে সমর্থন জানিয়ে একটি স্বাক্ষর করে দেন। কিন্তু এখন আইনমন্ত্রী বিরোধী দলকে ৫ মিনিটের জন্যে কোনো বিলে স্বাক্ষর করতে আহবান জানাচ্ছেন? শুধু মেয়াদ বৃদ্ধির জন্যে? আমরা তো সেটা চাই না। এ কথা একবার নয়, কয়েক হাজার বার বলা হয়েছে।

আরো লক্ষ্য করলাম সংসদে সেদিন সংরক্ষিত আসনের মনোনয়নপ্রাপ্ত মহিলা সাংসদরা খুব সক্রিয় ছিলেন এবং দাঁড়িয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ডেপুটি স্পিকার সাহেব সুযোগ দিয়েছে মাত্র দু'জনকে। বাকি যাদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন তারা সকলেই পুরুষ সাংসদ। মনোনয়নপ্রাপ্ত নারী আসনের সদস্যদের প্রতি এ ধরনের অবজ্ঞামূলক আচরণ হয় এটাই তো দেখে এসেছি এতোকাল। শেষ সময় এসেও তাই প্রমাণ করলেন ডেপুটি স্পীকার। এবং সে কারণেই এ অবমাননাকর আসনগুলোতে আমরা সরাসরি নির্বাচন চাই। তখন সাংসদ হিসেবে তাদের কদর থাকবে এবং দেখলাম মহিরা সাংসদরা নিজেরাও কিন্তু সরাসরি নির্বাচনের কথা বলার জন্যে দাঁড়ান নি। তারা দলের পক্ষে তাবেদারি করার জন্যে খালেদা জিয়াকে দোষারোপ করার জন্যে দাঁড়িয়েছেন। এ ছাড়া উপায় কি? আগামী

নির্বাচনের পর এ আসনগুলো না থাকলে তারা মনোনয়নই বা পাবেন কেমন করে? সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে মনোনয়নপ্রাপ্ত মহিলা সাংসদদেরও এক ধরনের স্বার্থান্বেষী ভাব জন্মে গেছে।

তবে এটাও বলা দরকার, গত ১০ বছরে আমরা দুটো সরকারের আমলেই দেখেছি মনোনয়নপ্রাপ্ত মহিলা সাংসদরা নিজেদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট নন। এ কথা তারা বিভিন্ন সময়ে খোলামেলাভাবেই বলেছেন। তাদের অবমাননাকর অবস্থান তাদের নিজেদের কাছেই ভালো ঠেকে নি।

বিরোধী দল উপস্থিত না থাকলে দুই-তৃতীয়াংশ হয় না এ কথা বারবার বলা হচ্ছে। এবং খালেদা জিয়াকে সরাসরি দায়ীও করা হয়েছে। ঠিকই আছে। কিন্তু জানতে পারি কি ৯ তারিখে সরকারি দলের সকল সাংসদ উপস্থিত ছিলেন কিনা? পত্রিকা মারফত বোঝা গেলো এ দিন মহিলা সাংসদদের 'বেশির ভাগ' উপস্থিত ছিলেন। তার মানে হচ্ছে সকলে উপস্থিত ছিলেন না। সাধারণ আসনের আওযামী লীগের সকল সাংসদও উপস্থিত ছিলেন না। তাহলে বিএনপি উপস্থিত হলেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোট হতো কেমন করে? এ প্রশ্ন কি আওয়ামী লীগ তার সাংসদের করেছে? সংসদের স্পিকার কি আওয়ামী লীগের সাংসদদের প্রতিও আহবান জানিয়েছেন যেনো তারা সেদিন সকলেই উপস্থিত থাকেন?

কোনো কারণে যদি বিরোধী দল উপস্থিত হয়েই যায় তাহলে যেনো বিলটি পাসে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। না, এমন কোনো উদ্যোগের কথা আমরা শুনি নি এবং তার কোনো লক্ষণ ৯ তারিখের সংসদে দেখি নি। আওয়ামী লীগের সাংসদদের ভাগ্য বালো যে, বিরোধী দল আসে নি। আসলে তো সরকারি দলের সদস্যদের অনুপস্থিতিই এ বিল পাস না হবার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। বিএনপি বা বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত হন নি কারণ তারা সংসদ বর্জনরত অবস্থায় আছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাংসদরা কেনো উপস্থিত থাকেন না? তারা কার সঙ্গে রাগ করে আছেন? সংসদে প্রায়ই সাংসদদের অনুপস্থিতির কারণে কোরাম হয় না। এ অবস্থায় কি করে আমরা আশা করতে পারি যে, সংরক্ষিত আসনের বিল সঠিকভাবে আলোচনা হয়ে পাস হতো?

সম্মিলিত নারী সমাজের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সংসদের স্পিকারের এ উদ্যোগের পেছনে কতখানি আন্তরিকতা আছে? তিনি এ উদ্যোগ বড়ো বেশি দেরি করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে তার আন্তরিকতা থাকলে আরো আগে

তিনি উদ্যোগ নিতে পারতেন। এখন সপ্তম সংসদ শেষ হবার আগে এটা একটা প্রহসনের মতো করা হচ্ছে। জনগণকে, বিশেষ করে নারী সমাজকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। এমনকি ডেপুটি স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। গত ১০ জুন সম্মিলিত নারী সমাজের প্রতিনিধিরা স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে তার অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সে সময় ডেপুটি স্পিকারকে অনুরোধ করা হয়েছিলো সরকারি দল আনীত মেয়াদ বৃদ্ধির বিল প্রত্যাহার করতে বলে সরাসরি নির্বাচনের বিল উত্থাপনের জন্যে উৎসাহিত করতে।

কিন্তু ডেপুটি স্পিকার তখন সম্মিলিত নারী সমাজের নেতাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার উদ্যোগ নেয়ার প্রতিশ্রুতি তো দেনই নি বরং তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন সরাসরি নির্বাচনের প্রশ্নে। তিনি সেদিন একটি দলীয় অবস্থান থেকেই কথা বলেছেন এবং বারবারই বিরোধী দলের না আসার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত তর্কাতর্কির মধ্যেই শেষ হয়েছে। কারণ তিনি কোন মতেই এই ব্যাপারে একমত হতে চান নি। তা হলে স্পিকারের উদ্যোগ কাদের স্বার্থে করা হয়েছে?

সম্মিলিত নারী সমাজ সপ্তম সংসদের সঙ্গে এই আসনগুলো বিলুপ্ত হবার জন্যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দলকেই দায়ী করেছে। তাঁরা বলেছেন, সংরক্ষিত আসন শুধু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির সম্পত্তি নয়। এই আসনগুলোতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে। কোনো দলের করুণায় তারা থাকবে না। নারীরা জনগণের কাছে জবাবদিহিতার মাধ্যমে সংসদে আসতে চায়। নারী আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবী হচ্ছে এই সংরক্ষিত আসন রাখতে হলে নির্বাচন পদ্ধতি বদল করতেই হবে। সরাসরি নির্বাচন না দিলে এই আসন রাখার অর্থ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জন্যে বোনাসের ব্যবস্থা করা। নারী সমাজ এই অবমাননাকর অবস্থা আর মেনে নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই নারীদের দাবীর প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখান নি। সম্প্রতি তিনি জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে তিনি নারীর ক্ষমতায়নের অনেক কথাই বলেছেন। কিন্তু তাঁর কথা ইউনিয়ন পরিষদ এবং মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কথা পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। সংসদের কথা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। অর্থাৎ এই নির্বাচনে তাঁরা নারীদের সরাসরি নির্বাচনে আসতে দিতে রাজি নন। তা হলে আসন সংরক্ষিত রাখার

জন্যে এতো উৎকণ্ঠা কেনো? এটা কি বোনাস হিসেবে পাবার সম্ভাবনা আছে বলেই? ত্রিশটি আসন তো কম নয়। আর যদি নারী সংগঠনগুলোর দাবীর দোহাই দিয়ে আসন সংখ্যাও বাড়িয়ে নেয়া যায় তা হলে তো আরও পোয়াবারো। দলের নারী সদস্যদের বলা যাবে,তোমরা ভালোভাবে কাজ করো। জিতে গেলে তোমাদের একটি করে সিট দেয়া হবে। এই মূলো ঝুলিয়ে দলের নারী কর্মীদের কাজও করিয়ে নেয়া যাবে।

অন্যদিকে খালেদা জিয়া গত ৯ জুলাই পল্টন ময়দানে বক্তৃতাকালে ঘোষণা দিয়েছেন, ক্ষমতায় গেলে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন দেবেন। তিনি আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি বিল গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন। এটা নারী আন্দোলনের দাবীর প্রতি সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য। তাঁকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু তিনিও এই কথা বলতে বড্ড বেশি দেরি করে ফেলেছেন। গত পাঁচ বছর নারী সংগঠনগুলো তাঁর দলের কাছ থেকে কোনো ধরনের কমিটমেন্ট পায় নি।

বিএনপির নেতাদেরও এ ব্যাপারে কথা বললে তাঁরা সব সময়ই নীতিগতভাবে একমত পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত দলীয় অবস্থান জানাতে দ্বিধা করেছেন। একটা ভাব, ম্যাডাম না বললে তো হবে না। এখন শেষ মুহূর্তে ম্যাডাম নিজেই এ কথা বলেছেন কি নির্বাচনের কথা ভেবে? তিনিও কি নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছেন যে, বিএনপি আগামীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং তাঁরাই এই আসনগুলোর ভাগ্য নির্ধারণকারী হবেন?

হায় রে, কপাল। সময় থাকতে কেউ কিছু করলো না; এখন দুই দলের ঠেলাঠেলিতে নারীদের সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমরা ইতিহাসে এই ঘটনা কালো কালিতে লিখে রাখবো।

[আজকের কাগজ, ১২ জুলাই, ২০০১]

অস্টম সংসদে সংরক্ষিত আসনে আনুপাতিক হারে মনোনয়নের বিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৫(৩) ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদে নারীর জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভাল উদ্দেশ্যেই কিন্তু এর নির্বাচন পদ্ধতি পরোক্ষ, অর্থাৎ সাধারণ আসনের

নির্বাচিত সাংসদরাই তাদের নির্বাচন করবেন। তবে সব সাধারণ আসনের সদস্যরা নির্বাচন করছেন যারা সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে সেই দল নারী আসন বোনাস পাবে। এই বিধান থাকায় সংসদে নারী আসন নিয়ে তামাশা তৈরি হয়েছে।

গত ৫০ বছর ধরয়ে এই তামাশা চলেছে। দিনে দিনে নারী আসন বেশ আকর্ষনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে তাই এতোদিন ধরে ১১টি সংসদে আসন সংখ্যা এবং মেয়াদ বেড়েছে, নির্বাচন পদ্ধতি বদলায় নি। প্রথমে দশটি আসন মাত্র দশ বছরের জন্যে থাকলে্ও সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনীতে আসন সংরক্ষণের মেয়াদ এবং আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়। সপ্তম সংসদ পর্যন্ত আসন সংখ্যা ছিল ৩০ টি। কিন্তু সে সময় মেয়াদ ও আসন বাড়োনোর বিল আনা হলেও বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকায় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দুই তৃতীয়াংশ আসন না থাকায় সংবিধানে এই ধারাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ অষ্টম সংসদে নারীদের জন্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সংবিধানে ছিল না, এবং সেই কারণে অষ্টম সংসদে জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে মাত্র ৫ জন নারী ছাড়া আর কোন নারী ছিলেন না।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বাংলাদেশে নারী আন্দোলন ১৯৮৭ সাল থেকে সরাসরি নির্বাচনের দাবি করে আসছে। ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ তাদের ১৭ দফায় সংরক্ষিত আসন সংখ্যা জেলাওয়ারী ৬৪ টি করা এবং সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার দাবি জানায়। এরপর থেকে নারী সংগঠনগুলো আসন সংখ্যা ও মেয়াদ বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে।

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর থেকে বিএনপি এবং আ্ওয়ামীলীগ উভয়ের কাছেই নারী সংগঠনগুলো তাদের দাবী জানায়। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল, এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত আ্ওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। তারা কেউই নারী সমাজের দাবী মেনে নেয় নি, বরং পরোক্ষ নির্বাচনে বা মনোনয়নের মাধ্যমে দলের পছন্দ মতো নারীদের সংরক্ষিত আসনের সাংসদ করেছে। উভয় ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই নারী সাংসদরা দলের কাছে জিম্মি থেকেছেন এবং নারীদের প্রতিনিধি হিশেবে সংসদে কিছুই করার সুযোগ পান নি। তাঁরা জনগণের সাথে্ও কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। অষ্টম

সংসদ নির্বাচনের আগে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী খুব জোরদার হলে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয়েই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। অস্টম সংসদে বিএনপি এবং জামাত ইসলামসহ চার দল দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তারা তাদের নির্বাচন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আসন সংখ্যা ৪৫ এবং পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আনুপাতিক হারে সংসদে নির্বাচনী দলের মধ্যে ভাগাভাগির ভিত্তিতে বিল উত্থাপন করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জাতীয় সংসদে ৪৫ মহিলা আসন সংরক্ষণে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে ৮টি নারী সংগঠন হাই কোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন। নারী সংগঠনের পক্ষে আইনজীবি ছিলেন প্রয়াত ড। এম জহির। নারী নেত্রীদের দায়েরকৃত রিট মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২২ জুন/২০০৪ সরকারের প্রতিরুল নিশি জারি করেন। সেই সংগে জাতীয় সংসদের ৪৫ সংরক্ষিত আসন সংশিষ্ট সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী কেন অবৈধ করা হবে না এ মর্মে পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারের মন্ত্রী পরিষদ সচিব, আইন সচিব, স্পীকার ও নির্বাচন কমিশনকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। বিচারপতি এম এ মতিন ও বিচারপতি তারিক-উল-হাকিম সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ প্রদান করেন। এরপর একই বিষয়ে নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়।

কিন্তু নারী সমাজের দাবীকে পাশ কাটিয়ে ও উপেক্ষা করে সরকার জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষনের বিধান সংবলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিলটি পাশ করে ১৫ মে, ২০০৪। এই সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদে নারী আসনের বিধান পুর্নবহাল করা হলো। বিলটি পাশ হওয়ার পরও সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় নি। জাতীয়তাবাদী দলের সরকার নারীদের জন্য ইতিবাচক নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও নারী সমাজের এই দাবীকে উপেক্ষা করেই সংসদে সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করে এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর আসন অনুপাতে তা বন্টনের প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় গৃহিত হয়। অথচ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের বিষয়টি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যেও ছিল। কিন্তু সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করে জনসমর্থনহীন এই দাবিটি সংসদে পাশ করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর বিরুদ্ধে গোটা নারী সমাজ ও রাজনৈতিক

দলগুলো সোচ্চার হয়ে উঠলেও সরকার একপেশে মনোভাব পোষণ করেন। নারী সংগঠনগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে নারী নেত্রীরা এর প্রতিবাদ জানায়।

সরাসরি নির্বাচনের দাবীটি উপেক্ষিত হওয়ায় নারী সংগঠনগুলো ক্ষুদ্ধ। রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে সমঅধিকারের কথা বলা হলেও সংরক্ষিত আসনের এই ব্যবস্থা সচেতন নারী সমাজের অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সব চেয়ে বড় দিক হচ্ছে এর কার্যকারিতা। ইতিপূর্বে যেসব নারী সংসদে গিয়েছেন, তারা শুধু শোভাবর্ধন ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেননি। ত্রিশটি আসন থাকার সময় হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বলেছিলেন তারা "৩০ সেট অলংকার"। এই অপমানজনক কথাও নারী সাংসদদের শুনতে হয়েছে।

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত মহিলা আসন করা হয়েছে ৪টি। এসব আসনে সংসদের বিভিন্ন দলের এমপিদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুযায়ী মহিলা সদস্য মনোনয়ন দেয়ার কথা। সংবিধানের বিধান তথা আনুপাতিক হারে ৬ জন করে সংসদ সদস্যদের অনুপাত ১ টি করে সংরক্ষিত আসন পড়েছে। অর্থাৎ যে দলের ৬টির বেশী আসন রয়েছে তারাই পাবে ১টি আসন। এছাড়াও সমঝোতার মাধ্যমে মহিলা আসন ভাগ হয়েছে। সেই অনুপাতে অস্টম সংসদে বিএনপি পেয়েছিল ৩০ টি আসন। শরিক দল, জামাত মিলে বিএনপি-জোট পেয়েছে ৩৩ আসন। এরশাদের জাতীয় পার্টি পেয়েছে ২টি আসন। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ পাওয়ার কথা ৯ টি আসন। কিন্তু এই নয়টি আসন তারা শেষ পর্যন্ত নেয়নি। অবশ্য এর পর নবম থেকে একাদশ সংসদ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে টানা তিন মেয়াদে আচে। তারা এর মধ্যে সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনীও এনেছে, কিন্তু সংরক্ষিত আসনের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি, বরং বিএনপির করা আনুপাতিক হারে মনোনয়নে দেয়ার বিধান জারী রেখেছে এই পর্যন্ত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারী আসনের সরাসরি নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। নারীর প্রকৃত সমস্যাগুলো নারীরাই উপলব্ধি করতে পারে। তাই অন্তত ১০০টি আসনে নারীরা সরাসরি নির্বাচিত হলে শতকরা নব্বই ভাগ নারীই দেখা যাবে সাধারণ নারীদের নিয়ে কথা বলছেন।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা কিভাবে ভাগ করা যাবে সে বিষয়েও নারী সংগঠন সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কোনও আলোচনারই মূল্যায়ন করেনি সরকার। সংসদের নারী সদস্যদের অলংকার হিসেবেই দেখা যাবে। বিএনপি সরকার দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এখানে রিটকারীর পক্ষে শুনানীতে ড. এমএ জহির যা বলেছিলেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "১৭ মে ২০০৪ জাতীয় সংসদের ৪৫ আসন সংরক্ষণ করে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংশোধনীতে ৪৫ মহিলা আসন সংসদ সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান সংবিধান পরিপন্থী। কারণ ৩০০ সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪৫ মহিলা আসন কিভাবে বন্টন হবে তার কোন হিসাব নিকাশ এই সংশোধনীতে নাই। মহিলা আসন বন্টনের জন্য যত ভাল আইন করা হোক না কেন সঠিক বন্টন করা যাবে না। বড় দুটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে সংরক্ষিত মহিলা আসন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনের কথা বলা হলেও তা ভংগ করে তারা জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের অসম্মান করেছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী কোন মহিলা রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলে এই পদ্ধতিতে মহিলা আসনের সদস্য হতে পারবেন না। তাই ৪৫ মহিলা আসন সংরক্ষণ করে আনীত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী সংবিধানের মূল কাঠামো গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার পরিপন্থী।

সরকার যত কিছু বলুক, নারী সংগঠন তাদের দাবী না মানা পর্যন্ত লড়ে যাবে। সরাসরি নির্বাচন শুধু নারী সমাজের দাবী নয়, দেশের সাধারণ মানুষেরও দাবী। আর এই দাবী না মানার অর্থ দেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। যখনই সরকারের মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা হয়েছে তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষরাই এগিয়ে এসেছে।

শেষ কথা

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবী করা হচ্ছে এই জন্য নয় যে নারীরা চিরদিন এরকম বিশেষ সুবিধা নিয়ে রাজনীতিতে থাকবেন। এটা মোটেও কাম্য নয় এবং এটা নারীর জন্যে সম্মানজনকও নয়। এই দাবী করতে হয়েছে এই কারণে যে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাষ্ট্র নারীকে যে স্বীকৃতি ও স্বাধীনতা দেবার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা সেটা করে না। তাই শুরুতে সংবিধানে সংরক্ষিত আসন রাখার বিষয়টি নারী আন্দোলন সমর্থন করেছে এবং এর পক্ষে লড়াইও করেছে। কিন্তু কয়েক মেয়াদ পার করে নারীরা টের পেয়েছে এই আসনগুলো বড় বড় রাজনৈতিক দল, যারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্টতা পায়, তাদের জন্য বোনাস হয়ে গেছে; নারীদের রাজনৈতিক সত্ত্বাকে ধ্বংস করে দিয়ে। রাজনৈতিক দলগুলোতে বিপুল সংখ্যক নারী যোগ দিচ্ছেন এবং কাজ করছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো, ''আরপিও'[2]র ৯০-এর খ-এর খ(২) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে অন্তত ৩৩ শতাংশ সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্যে সংরক্ষণের বিধান এখনো মানে নি।

ফলে নারীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা নেতৃত্ব পর্যায়ে গিয়ে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং জাতীয় সংসদে সাধারণ আসনে তাদের মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে না বা দিতে গড়িমসি করা হচ্ছে। সম্মিলীত নারীসমাজ এবং অন্যান্য নারী সংগঠন জাতীয় সংসদে কমপক্ষে ১০% মনোনয়ন নারীদের দেয়া বাধ্যতামূলক করার দাবী জানিয়ে আসছে এবং এখনো তাই চায়। পাশাপাশি জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের পাশাপাশি যদি ৫০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে তাহলে তা হতে হবে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে। বর্তমান সংসদে আওয়ামী লীগের যে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্টতা আছে তা দিয়ে সংবিধানে সংশোধনী আনা সম্ভব এবং এর জন্যে নির্বাচন কমিশনকে যেসকল পদক্ষেপ নিতে হবে তাও করা সম্ভব।

দরকার শুধু সদিচ্ছা।

---

[2] Representation of the People's Order, 1972 বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ